প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভার্সাই সন্ধি ও লিগ অব নেশনস

ইউনিট ৩

ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পেছনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণসমূহ জড়িত ছিল। ফলে ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ডকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক এবং একমাত্র কারণ ভাবার কোনো সুযোগ নেই। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ, সংস্কৃতিগত দৈন্য ও উৎকর্ষতার বিপরীতে আরো কিছু গৌণ কারণ এ যুদ্ধকে প্রণোদিত করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পেন্ডুলামের মত দুলতে থাকা রাজক্ষমতার দেশগুলোতে দৃষ্টি দিয়ে অনেক রাষ্ট্রচিন্তাবিদই তৎকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিলেন যার পর নাই হতাশ। বিশেষ করে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার পাশাপাশি একে অন্যের উপর অহেতুক চড়াও হওয়ার মানসিকতা নিয়ে চেষ্টা চলছিল একের পর এক জোট গঠনের প্রচেষ্টা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের এই প্রবণতা তাদের কতটুকু লাভবান করেছিল তা নিয়ে হয়ত নিশ্চিত করে কিছু বলার সুযোগ নেই। তবে এতে করে পুরো ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবেশ যে অশান্ত হয়ে উঠেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

পাঠ- ৩.১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্ব

পাঠ- ৩.২ অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সামরিক শক্তি

পাঠ- ৩.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ

পাঠ- ৩.৪ বিভিন্ন রণক্ষেত্রের সংঘাত

পাঠ- ৩.৫ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

পাঠ- ৩.৬ ভার্সাই সন্ধিচুক্তি

পাঠ- ৩.৭ লিগ অব নেশনস ও তার ব্যর্থতা

পাঠ-৩.১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর নানা কারণ রয়েছে। তবে যুদ্ধের একেবারে শুরুর গল্পটাকে সাজানো যেতে পারে সরাসরি সারায়েভো হত্যাকাণ্ড থেকেই। বসনিয়ার জাতীয়তাবাদী গ্রুপ ব্ল্যাক হ্যান্ড এক্ষেত্রে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে উগ্রপন্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়। তারা অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ ও কাউন্টেস সোফিয়াকে হত্যা করে। সারায়েভো হত্যাকাণ্ডের দায়টা তারপরেও পুরোপুরি জাতীয়তাবাদীদের উপর বর্তায় না। বিশেষ করে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা একটি দুর্বল রাষ্ট্র ছিল। তারা ইউরোপের রাজনৈতিক পরিসরে তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা কোনোদিনই রাখতে পারেনি। এই সুযোগ নিয়ে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অহেতুক সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশা পেয়ে বসে। তারা ১৮৭৪ সালে এসে দখল করে নেয় বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ভূখণ্ড। এরপর ১৯০৮ সালে এই ভূখণ্ড একীভূত করা হয়।

বসনিয়ায় বসবাসরত মুসলিম সম্প্রদায় থেকে শুরু করে সেখানকার সার্বরাও এ দখলদারিত্ব মেনে নিতে পারেনি। তারা অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সাথে না থেকে সরাসরি সার্বিয়া কিংবা অন্য কোনো স্লাভ ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হতেই বেশি আগ্রহী ছিল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের পরিণতি ঘটায় তারা ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রীয় যুবরাজ হত্যার মধ্যদিয়ে। সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফের অনুজ ফার্দিনান্দ ছিলেন আর্চ ডিউক কার্ল লুডিগের ছেলে। একটি ভোজসভায় ১৮৯৫ সালের দিকে কাউন্টেস সোফিয়ার সাথে সাক্ষাতের সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত প্রেম গড়িয়ে শুভ পরিণয়। তবে ফার্দিনান্দের প্রথম দিকের বৈবাহিক জীবন অতটা সুখের হয়নি।

আর্চডিউক ফ্রেডরিখের স্ত্রী এলিজাবেথের লেডি ইন ওয়েটিং সোফিয়ার সাথে ফার্দিনান্দের এই সম্পর্ককে ফ্রেডরিখ প্রথম প্রথম আঁচ করতে পারেননি। তিনি যখন বুঝতে পারেন তখন একে যেকোনো মূল্যে আটকাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এতে করে আর্চডিউক কন্যা মারিয়া ক্রিস্টিনের পর্যন্ত কপাল পোড়ে। অন্যদিকে সোফিয়া রাজপরিবারের কেউ না হওয়াতে তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ঘোর আপত্তি জানান ফ্রাঞ্জ জোসেফ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস, জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেম ও ১৩ তম পোপ লিও ফার্দিনান্দের পক্ষাবলম্বন করে রাজার কাছে সুপারিশ করেন। এতে বরফ গললেও শেষ রক্ষায় হয়নি ফার্দিনান্দের। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৭ জন অনভিজ্ঞ বন্দুকধারী আততায়ীর সামনেই তাঁকে সস্ত্রীক জীবন দিতে হয়েছিল।

অস্ট্রো-হাঙ্গেরির রাজ পরিবার অবৈধভাবে দখল করেছিল বসনিয়ার ভূখণ্ড। সেখানে বসবাসরত মুসলমানদের অনেককে গণহত্যার শিকার হতে হয় হাঙ্গেরীয় হানাদার বাহিনীর হাতে। পাশাপাশি সেখানে বসবাসরত সার্ব-ক্রোয়াটরাও রেহাই পায়নি এ নির্মম হত্যাযজ্ঞ থেকে। তারপর যারা হাঙ্গেরির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় তাদের উপর সীমাহীন জুলুম-নিপীড়ন চলতে থাকে। অনেকে শুধুমাত্র স্বাধীন বসনিয়া আন্দোলনের সাথে জড়িত অনেকের শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যায়। এমনি এক তরুণের নাম প্রিন্সিপ যে কৈশোরেই জীবনের স্বপ্ন মুছে যাওয়ায় বাধ্য হয় প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্পে। আর তার হাতেই প্রাণ যায় ফার্দিনান্দ ও সোফিয়ার। এর পাশাপাশি নেদেলজাকো ক্যাবরিনোভিস কিংবা ড্যানিলো আইলিচও জীবনের নানা ক্ষেত্রে হাঙ্গেরির দখলদারিত্বের যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে বলতে গেলে সর্বস্ব খুইয়ে তারা বাধ্য হয়েছিলেন সরাসরি ফার্দিনান্দকে নির্বংশ করে বসনিয়ার উপর থেকে হাঙ্গেরির অশুভ ছায়া দূর করতে। প্রথম কয়েকজন পরিকল্পনাকারী পরপর ব্যর্থ হলেও কিশোর প্রিন্সিপ তিনটি গুলিতে হত্যা করে ফার্দিনান্দ-সোফিয়াকে।

নেহাত ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহা থেকে হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণকারীরা মরতে গিয়েও পারেনি। তাদের কেউ কেউ গুলি চালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, কেউবা সায়ানাইড পিল খেয়েও অদ্ভুতভাবে বেঁচে যায়। আর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হয় হাঙ্গেরিয়ান বাহিনীর হাতেই। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে যক্ষ্মা আক্রান্ত হয়ে পচে মরার আগে তাদের কপালে রিমান্ডের যে নির্যাতন জোটে তাতেই ফাঁস হয় এ হত্যাকাণ্ডের। হাঙ্গেরি দাবি করে সার্বিয়া এই হত্যাকাণ্ডকে প্রণোদিত করেছে। আর এর সূত্র ধরেই তারা নানাবিধ চাপ প্রয়োগ করতে থাকে সার্বিয়ার উপরে। বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলে সার্বিয়াকে। কিন্তু প্রথম থেকেই অবিচল সার্বিয়া এতে টলতে রাজি ছিল না। হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীদের জবানবন্দি থেকে নিশ্চিত করা হয় যে এর নীলনকশা সাজানো হয়েছিল বেলগ্রেডে। সার্বিও জাতীয়তাবাদী গ্রুপ নারোদনা ওদব্রানার প্রণোদনাতেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এত সহজে সংগঠিত হয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এমন দাবি করে সার্বিয়ার উপর আক্রমণের চিন্তা করে হাঙ্গেরির বাহিনী।

পাঠ-৩.২ অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সামরিক শক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেভাবেই শুরু হোক না কেনো যুদ্ধবাজ দেশগুলোর উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। বিভিন্ন স্থানে স্ব আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য তারা এই যুদ্ধ বাধিয়েছিল। অস্ট্রো-হাঙ্গেরির ফার্দিনান্দ কিংবা সোফিয়ার হত্যাকাণ্ড থেকে বড় বিষয় তাদের একটা আক্রমণের কারণ প্রয়োজন ছিল। আর সেটা পাওয়ার সাথে সাথে পরস্পর বিবাদে জড়াতে তাদের সময় লাগেনি। একত্রীভূত ইতালি কিংবা জার্মানির হোহেনজোলার্নদের একক দাপট মেনে নেয়া তাদের জন্য অনেকটাই অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়। যুদ্ধে অক্ষশক্তি কিংবা মিত্রশক্তি যাদের কথাই বলা হোক না কেনো কেউ শক্তিমত্তার দিক থেকে পিছিয়ে থাকার পাত্র নয়। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মান, ইতালি, কানাডা, ফরাসি, তুরস্ক, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, গ্রিক কেউই শক্তিমত্তা প্রদর্শনের দিক থেকে পিছিয়ে থাকতে চায়নি। আর এর ফলাফল হিসেবেই দীর্ঘ চার বছর স্থায়ী হয়েছিল এ মরণঘাতী সংগ্রাম।

ব্রিটেন

ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর পাশাপাশি তাদের বিমান ও সেনাবাহিনীও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তবে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর তুলনায় তাদের নৌবাহিনী ছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জনশক্তিও সময়ের সাথে সাথে বেড়ে বিশাল আকার ধারণ করে। ১৯১৪ সালে মাত্র ২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৩২ জন সৈন্য ব্রিটিশ সৈন্যের প্রতিনিধিত্ব করলেও ১৯১৬ সাল নাগাদ এই সৈন্য সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয় ২৬ লাখের কাছাকাছি। যার প্রায় ১৬ লাখ সৈন্য হতাহত হওয়ার ঘটনা থেকেই বোঝা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত ধ্বংসাত্মক ছিল। তেমনি প্রথম দিকের একটি বেলুন ইউনিট দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিমান বাহিনীও বলার মত শক্তিমত্তা অর্জন করে। তারা ১৯১৫ সালের মে মাসের দিকে ১৬৬ এর মত বিমান সংযোজন করতে সক্ষম হয়।

১৮টির মত আধুনিক ড্রিডনট, ১০টি ব্যাটল ক্রুজার, ২০টি টাউন ক্রুজার, ১৫টি স্কাউট ক্রুজার, ২০০টির মত ডেস্ট্রয়ার আর ২৯টি শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ নিয়ে তখনকার দিনে ব্রিটিশ নৌবাহিনী ছিল অন্যতম সেরা। অর্কনির স্কাপা ফ্লো কিংবা স্কটল্যান্ডের রোসিথে থেকে জার্মানদের যে কোনো ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধে সদা প্রস্তুত থাকতো ব্রিটিশ নৌবাহিনী। আর এক্ষেত্রে ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার, সাবমেরিন ও হালকা অস্ত্রে সজ্জিত জাহাজগুলো এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করত। এর পাশাপাশি ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল, জিব্রালটার, মালটা ও আলেকজান্দ্রিয়া উপকূলের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে দুটি বাটলক্রুজার ও ৮ টির মত ক্রুজার। তবে জার্মান ইউবোটের আক্রমণে এই শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনীও বেশ কয়েক দফা সংকটে পরে। যুদ্ধে জার্মানরা প্রথম দিকে তিনটি ক্রুজার ও একটি ডেস্ট্রয়ার হারালেও তারা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ আরথোসার প্রায় ধ্বংস করে দেয়। এদিকে জার্মান ইউবোটের লাগাতার আক্রমণে ১৯১৪ সালের মধ্যেই ব্রিটিশরা তাদের যুদ্ধ জাহাজ ক্রেসি, আবুকির ও হগ হারায়। এতে প্রায় ১ হাজার ৪০০ নৌসেনার প্রাণ যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে পেতে রাখা মাইনের বিস্ফোরণে অনেক ব্রিটিশ নৌবহরের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

১৯১৪ সাল থেকে শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন জার্মান নৌ অধিনায়ক ফাঞ্জ ফন হিপার। তিনি নানাস্থানে আক্রমণ করে ব্রিটিশদের জন্য সংকট তৈরি করে। তবে নানা স্থানের যুদ্ধে এত ক্ষয়ক্ষতি ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে নিঃশেষ করতে পারেনি। তারা ১৯১৫ সালের ২৩ জানুয়ারি জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে এক মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। জার্মান যুদ্ধজাহাজ সিডলিজ ও ব্লচার এবার আক্রান্ত হয় ব্রিটিশ নৌসেনার দ্বারা। জার্মানরা এর প্রতিশোধ নিতে ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল ডেভিড বিটির ফ্ল্যাগশিপ লায়নের সলিল সমাধি নিশ্চিত করে। ব্রিটিশরা আবার নতুন করে জার্মান নৌসেনার মুখোমুখি হয় ১৯১৬ সালের ৩১ মে জুটল্যান্ডের যুদ্ধে। এবার দুপক্ষেই প্রচুর হতাহত হয়। তাদের প্রত্যেকেরই ক্ষয়ক্ষতি হয় অনেকগুলো যুদ্ধজাহাজ, ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও ব্যাটল ক্রুজার। এতে করে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি হতাশ হয়ে পড়ে। তারপরেও জুটল্যান্ডের লড়াইকে ব্রিটিশ কমান্ডারদের পক্ষ থেকে একটি বিজয় হিসেবে দাবি করা হয়। এরপর থেকেই ব্রিটিশ নৌবাহিনী বুঝে যায় যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকতে হলে সবার আগে জার্মান ইউবোটগুলোর আক্রমণ ঠেকাতে হবে। অন্যথায় এই বিপদজনক নৌযানগুলো সমুদ্রপথে কাউকেই আর দাঁড়াতে দেবে না। আর এতো কিছুর পরেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক ব্রিটিশ নৌবাহিনীরই প্রায় ৩৪ হাজর ৬৪২ জন সদস্য নিহত হয় যার মধ্যে অনেক এশীয় নাগরিক ছিল। আর আহতের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না।

জার্মানি

কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম ও আর্মি চিফ অব স্টাফ জেনারেল হেলমুট ফন মোল্টকির অধীনে ছিল চৌকশ জার্মান বাহিনী। ১৯১৪ সালের বাস্তবতায় জার্মান সেনাবাহিনী ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী। পরবর্তীকালে জেনারেল ফন ফাকেনহায়েন কিংবা পল ফন হিন্ডেনবার্গ সেনাপ্রধান হলেও তাদের শক্তিমত্তায় তেমন হেরফের ঘটতে দেখা যায়নি। বরং যুদ্ধে পরাজয় ও লজ্জাজনক ভার্সাই চুক্তিতে বসার পূর্ব পর্যন্ত জার্মান সেনাবাহিনীকে ক্রমশ উন্নত থেকে উন্নততর হতে দেখা গেছে। ১৯১৪ সালের দিকে প্রায় ৭ লাখ সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ২৫টি কোর নিয়ে যাত্রা শুরু করে জার্মান বাহিনী। এক্ষেত্রে বিদ্যমান ৮টি কমান্ডের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে আরো ১০টি যুক্ত হলে অপ্রতিরোধ্য রূপ ধারণ করে জার্মান বাহিনী। বিশেষ করে যুদ্ধ ঘোষণার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে রিজার্ভ সৈন্যদের ডেকে এনে সেনা সংখ্যা ৩৮ লাখে উন্নীত করা হয়। এক্ষেত্রে ১৯১৬ সালের আগস্টে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্য ছিল ২৮ লাখ ৫০ হাজার। এ সময় পূর্ব রণাঙ্গনেও সৈন্য ছিল প্রায় ১৭ লাখের মত। আর এক্ষেত্রে জার্মান সৈন্য নিয়োগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানা যায় যুদ্ধ শেষ হলে প্রায় ১৭ লাখ ৫০ হাজার সৈন্য সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল বলে জানা গেছে।

জার্মান সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বিমান ও নৌবাহিনীও ছিল বেশ শক্তিশালী। বিশেষ করে তাদের সেনাবাহিনী প্রথম থেকে শক্তিশালী হওয়াতে বিমান ও নৌবাহিনী উন্নতকরণের তেমন গুরুত্ব দেয়নি জার্মানি। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর চেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে দেখে নৌ ও বিমান বাহিনীকেও সমান গুরুত্ব দিলে একটি পর্যায়ে এসে অন্যদের ছাপিয়ে যায় তারা। বিশেষ করে নৌপথে জার্মানির ডিজেল চালিত ইউবোট ও সাবমেরিন যে কোনো যুদ্ধ জাহাজের সর্বনাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। পাশাপাশি তাদের ১৭টি অত্যাধুনিক ড্রিডনট, ৫টি ব্যাটেল ক্রুজার, ২৫টি ক্রুজার, ২০টি যুদ্ধজাহাজ ও ১০টি ইউবোট নিয়ে জার্মানির নৌবাহিনী হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বৃহত্তম। তবে আকৃতিতে যাই হোক না কেনো নৌপথে জার্মান বাহিনী যে কোনো দেশকে সংকটে ফেলে দেয় বিভিন্ন স্থানের নৌযুদ্ধে।

সিনক্রোনাইজড গিয়ার আবিষ্কৃত হওয়ার পর জার্মান বিমান বাহিনী বেশ উপকৃত হয়। বলতে গেলে এ সময় থেকেই থেকেই তাদের নামেমাত্র উপস্থিত থাকা সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের যুগান্তকারী আবিষ্কার রোঁলা-গারোঁর উপযুক্ত জবাব দিতে এদিকে জার্মানিও তৈরি করে ফকার-ই, হালবারস্ট্যাড এবং অ্যালব্যাট্রস ডি-এর মত বিমান। এদিকে ম্যালফ্রেন ফন রিচথোপেন কিংবা আর্নেস্ট ওডেট হয়ে ওঠেন আকাশ যুদ্ধের প্রতীক। ধীরে ধীরে লোকবল বাড়তে বাড়তে ১৯১৭ সালের দিকে এসে এক পশ্চিম রণাঙ্গনেই জার্মানির ৩ হাজার ৬৬৮ টি বিমান উড়তে দেখা যায়। আর যুদ্ধবিরতিকালে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায় এই বাহিনীকেই। তখন জার্মান আর্মি এয়ার সার্ভিসের ২ হাজার ৭০৯টি বিমান এবং সাড়ে চার হাজার পাইলট থাকার কথা। ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মান বিমান বাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। তবে এ বিলুপ্তির আগে জার্মান বাহিনী থেকে প্রায় ৬ হাজার ৮৪০ জন বৈমানিক নিহত ও নিখোঁজ হয়েছে বলে স্বীকার করা হয়। শেষ পর্যন্ত ভার্সাই চুক্তির অন্যতম শর্তবলে ১৯২০ সালের ৮ মে বিলুপ্ত হয় জার্মান বিমান বাহিনী।

যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিনরা জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে সমান তালে আক্রমণ চালায়। বলতে গেলে তাদের এই আক্রমণ যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে দিয়েছিল। ১৯১৪ সালের দিকে ৯৮ হাজার নিয়মিত মার্কিন সৈন্যের প্রায় ৪৫ হাজার মোতায়েন করা হয় দেশের বাইরে। জেনারেল লিওনার্ড উডের সুপারিশক্রমে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১ লাখ ৪০ হাজার করতে সময় নেননি। আর ১৯১৭ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্র যখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন জেনারেল পার্শিংয়ের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয় আমেরিকান এক্সপিডিশনারি ফোর্স বা এইএফ। এরই মাঝে মার্কিন কংগ্রেস ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিউজ জনসন প্রণীত সিলেক্টিভ সার্ভিস অ্যাক্ট পাস করে। এর আওতায় ২১-৩০ বছর বয়সের সব মার্কিন পুরুষ নাগরিকের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এই আইনের আওতায় মার্কিন সেনাবাহিনীর জনবল বাড়তে থাকে।

চাকরি প্রত্যাশী মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও দলে দলে যোগ দিতে থাকে সেনাবাহিনীতে। তাদের আগমনে ১৯১৮ সাল নাগাদ মার্কিন সামরিক বাহিনীর আকার দাঁড়ায় ২ কোটি ৩৯ লাখ ৮ হাজার ৫৬৬ জনে। আর তার মধ্যে প্রায় ৪০ লাখ পুরুষকে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয় সামরিক বাহিনীতে। এরা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়ে দায়িত্ব পালন করে দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধে। এর মাধ্যমেই ১৯১৮ সালের দিকে এসে এক ফ্রান্সেই মার্কিন সেনাবাহিনীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়েছিল। মার্কিন বিমান ও নৌবাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করেই মূলত কোণঠাসা করে ফেলে অক্ষ শক্তিকে। ১৯০৩ সালের দিকে

রাইট ব্রাদার্স বিমান আবিষ্কার করলে যুক্তরাষ্ট্র সেটাকে যুদ্ধে ব্যবহারের কথা চিন্তা করে। শেষ পর্যন্ত এর প্রায় ১৪ বছর পর প্রথমবারের মত যুদ্ধে বিমান বাহিনীর সম্পৃক্তি ঘটায় তারা। আর ১৯১৮ সালের দিকে প্রথমবারের মত সরাসরি ফ্রান্সের মাটিতে বিমান থেকে হামলা করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্যকে। বিমান হামলা চালিয়ে শত্রুকে পর্যুদস্ত করে ইতিহাস বিখ্যাত মার্কিন বৈমানিক হচ্ছেন এডওয়ার্ড রিকেনবেকার, ফ্রেডরিখ গিলেট ও উইলফ্রেড রিভার। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নৌবাহিনী হিসেবে ১৮১৪ সালের দিকেই মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়েছিল। এসব জাহাজ আটলান্টিকের বিস্তৃত এলাকায় মার্কিন সামরিক ও বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে নিরাপত্তা প্রদানের কাজ করত। তবে কুশলী জার্মান নৌবাহিনীর ইউবোট থেকে চার্জ করা মাইনের আঘাতে এসব যুদ্ধ জাহাজের ব্যাপক ক্ষতি গুণতে হয় যুক্তরাষ্ট্রকে।

ইতালি

অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশ ইতালি শুরু থেকেই যুদ্ধবাজ দেশগুলোর শীতল সম্পর্ক থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ১৯১৫ সালের ২৬ এপ্রিল থেকে বিশ্বযুদ্ধে তাদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মিলেছে। তবে এ যুদ্ধে তারা প্রথম থেকেই তেমন কোনো সুবিধা করতে পারেনি। ২৫ পদাতিক এবং ৪টি ক্যাভালরি ডিভিশনের সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে জড়ায়। এক্ষেত্রে ব্রিটেন সরাসরি তাদের অর্থসাহায্য করার কথা বলে। তারা মাত্র ১২০টি কামান ও ৭০০টি মেশিনগান নিয়ে এসময় অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে সর্বাত্মক হামলা চালায়। আইসোনজো অভিযানের একেবারে গোড়ার দিকের দু সপ্তাহেই ইতালির বাহিনী তাদের ৬০ হাজার সৈন্য হারায়। এদিকে শীতকালে আক্রমণ বন্ধ থাকলেও শেষ পর্যন্ত ইতালীয় বাহিনী তাদের লাখ তিনেকের মত সৈন্য হারিয়েছে। বস্তুত এসব সৈন্যের সিংহভাগ ছিল নানা পদে প্রতিষ্ঠিত যারা যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। তবে প্রায় সাত বারের মত শত্রুর ব্যুহ ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল এই বাহিনী।

১৯১৬ সালের আগস্টে গরজিয়ায় ইতালীয় বাহিনীর সফলতা বাকিদের সতর্ক করে দেয়। তারা নতুন এটা ভেবে সবাই তাদের দুর্বল প্রতিপক্ষ ভাবত এতদিন। কিন্তু এ যুদ্ধের সাফল্য পরিস্থিতি যেমন বদলে দেয় তেমনি ইতালির শক্তিমত্তা সম্পর্কেও নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে সবাইকে। প্রথম দিকে বেশ দুর্বল হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও বিভিন্ন যুদ্ধে সফলতা ইতালীয়দের সাহস বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয় শত্রুসেনার মনে ত্রাস সৃষ্টি করে। গ্যারিবল্ডির রক্ত তাদের ধমনীতে বহমান তা প্রমাণ করতে একের পর এক আক্রমণ শানাতে থাকে ইতালীয়রা। ১৯১৫ সালের বসন্ত আসার আগেই ইতালীয় বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯১৫ সালে জেনারেল লুইগি কাডোরর্নার অধীনস্থ ২৫টি পদাতিক ও ৪টি ক্যাভালরি ডিভিশন এক্ষেত্রে তাদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন শুরু করে।

লুইগি কাডোর্নারের অধীনস্থ মাত্র ১২০টি কামান এবং ৭০০টি মেশিনগানধারী সৈন্যরাই ১৯১৫ সালের মে মাসের যুদ্ধে কাঁপন ধরিয়ে দেয় অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সৈন্যদের মাঝে। তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ইতালির প্রতিকূল হয়ে পড়ে। ইতালীয় সৈন্যদের সর্বত্মক হামলার মুখে আক্রান্ত সেনারা প্রতিরোধব্যুহ রচনা করে। এবার পাল্টা আঘাতে ছত্রখান হয়ে পড়ে ইতালির সৈন্যরা। আইসোনজো অভিযানের সপ্তাহ না পেরোতেই ৬০ হাজার ইতালীয় সৈন্য মারা যায়। এদিকে যমদূতের শীতলতা নিয়ে ঋতু পরিবর্তন হয়। তুষারে চারদিক ঢাকা পড়তে শুরু করে হামলা বন্ধ করে ইতালি। কিন্তু এরই মাঝে হতাহত সৈন্যের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে তাদের। ৭ বারের মত আক্রমণ করে শত্রুর ব্যুহ ভেদ করতে ব্যর্থ কডোর্না এবার সাথে থাকা ৩ হাজার ফিল্ড গান পর্যন্ত খুইয়ে বসেন।

কানাডার সৈন্যদল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপের নানা দেশ যেখানে লক্ষাধিক সৈন্যের সমাবেশ করতে ব্যস্ত সেখানে মাত্র ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের বাহিনী গঠন করেছিল কানাডা। একটি সমুদ্র বন্দর ও ডকইয়ার্ডের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সৈন্যরাই ছিল তাদের মূল ভরসা। তবে বিশ্বযুদ্ধের আলামত পেয়ে তারা নতুন করে বাহিনী তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফল হিসেবেই ১৯১৪ সালের অক্টোবর নাগাদ কানাডার সৈন্য বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে বেড়ে গিয়ে ৩০ হাজারে উন্নীত হয়। তবে এর আরো এক বছর পর ১৯১৫ সালে ইপ্রেঁ রণাঙ্গনে গিয়ে যোগদান করে কানাডার বাহিনী। তবে লে. জেনারেল উইলিয়াম অ্যান্ডার্সনের নেতৃত্বাধীন এই বাহিনী পেশাদার জার্মানদের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। মাত্র দু'সপ্তাহের লড়াইয়েই ৫ হাজারের বেশি সৈন্যের হতাহতের মধ্য দিয়ে অনেকটা দুর্বল হয়ে যায় কানাডা। তবে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ক্রমশ লড়াইয়ে ফিরে আসে কানাডার বাহিনী। ১৯১৬ সালের দিকে ফ্রান্সের রণাঙ্গনে প্রেরিত বাহিনী প্রথমবারের মত সফলতার মুখ দেখে। ১৯১৭ সালের দিকে জেনারেল জুলিয়ান বায়ানগের বাহিনী ভিমি রিজের দখল নিতে খুব বেশি সময় নেয়নি। জেনারেল আর্থার কুরি বায়ানগের স্থলাভিষিক্ত হলেও কানাডীয় বাহিনীর সাফল্য অব্যাহত থাকে।

শুরুতে দুর্বল হিসেবে পরিচিত এই কানাডীয় সৈন্যরাই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে একের পর এক সাফল্য লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ৬ লাখ কানাডার নাগরিক যুদ্ধে যোগদান করে যার মধ্যে ৪ লাখ ১৮ হাজার কানাডীয় নাগরিক কাজ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এক্সপিডিশনারি ফোর্স হিসেবে। এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের অনেকেই লাভ করে ভিক্টোরিয়া ক্রসসহ আরো অনেক পুরস্কার। তবে কানাডিয়ান এক্সপিডিশনারি ফোর্স তথা সিইএফের প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার সৈন্য এ যুদ্ধে হতাহত হয়েছিল। অনেক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে নিহত কানাডীয় সৈন্যের সংখ্যা কম করে হলেও ৫৬ হাজার ছাড়িয়েছিল তখন। এর বাইরে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীতে নিযুক্ত কানাডিয়ান সৈন্যের সংখ্যাও নেহায়েত কম ছিল না।

ফ্রান্স

১৯১০ সালের দিকে ফরাসি আর্মি এয়ার সার্ভিস গঠন করা হলে তা ইউরোপের ত্রাস হিসেবে আবির্ভূত হয়। পাশাপাশি তাদের সেনা ও নৌবাহিনীও ছিল বেশ বিখ্যাত। ১৯১২ সালের মধ্যেই তারা ফিল্ড আর্মিসহ ফাইভ স্কোয়াড্রন বিমান তাদের সার্ভিসে যুক্ত হয়। প্রায় ৬টির মত বিমান নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাদের এক একটি ফিল্ড আর্মি। এদিকে ১৯১৪ সালে না পড়তেই ফ্রান্সের অধিকারে থাকা বিমানের সংখ্যা দেড়শ' হয়ে যায়। ফারম্যান এমএফ-৭, ফারম্যান এইচএফ-২০ ও ব্লেরিওঁ-১১ বিমান মিলে সংখ্যাটা প্রাথমিকবাবে ১৩২ ছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে ১৯১৫ সালের মধ্যেই জার্মান হামলায় ফরাসি বিমান বাহিনী বিস্তর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ সময় ক্ষতি কাটিয়ে উঠে নতুন করে লড়াই শুরু করার উদ্যোগ হিসেবে ফ্রান্স ২ হাজার ৩০০ বিমান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ভয়েসিন ফাইভ, মরানি সাউলনাই, নিউপোর্ট সেকেন্ড, ফারম্যান এমএফ- সেকেন্ড প্রভৃতি তৈরিতে গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি। আর সামার অফেন্সিভ শুরুর আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্স মওজুদ করে প্রায় ১ হাজার ১৪৯টির মত বিমান। তবে দ্রুত ফ্রান্সের বিমান উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯১৭ সালে তা ২ হাজার ৮৭০ হয়েছিল । যুদ্ধ বিরতির পূর্বে ফরাসি বিমান বাহিনীর জনবল ছিল ১ লাখ ২৭ হাজার ৬৩০ যাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল ৩ হাজার ২২২টি বিমান। এক্ষেত্রে রেনে ফ্রাঙ্ক, জর্জেজ গাইনেমাঁ, চার্লস নানগেসাঁ ও জর্জ ম্যাডোঁর মত জগদ্বিখ্যাত বৈমানিক ছিলেন ফ্রান্স বিমান বাহিনীর কর্ণধার।

অ্যাটাচড ক্যাভালরি ও ফিল্ড আর্টিলারিসহ ২১টি আঞ্চলিক কোরের ৪৭টি ডিভিশন নিয়ে ১৯১৪ সালের দিকে গড়ে ওঠে শক্তিশালী ফরাসি সৈন্যদল। এক্ষেত্রে ফরাসি সৈন্য সংখ্যাই ছিল শুরুতে ৭ লাখ ৭৭ হাজার যার সাথে যুক্ত হয়েছিল ঔপনিবেশিক অঞ্চলের আরো ৪৬ হাজার সদস্য। তবে পশ্চিমের রণাঙ্গনে সব সৈন্য মোতায়েন না করে তাদের বেশিরভাগ সৈন্য মোতায়েন করা হয় পূর্বের রণাঙ্গনে। অনেক সৈন্য ফ্রান্সের অভ্যন্তরে আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে অবস্থান নেয়। ১৯১৪ সালের গ্রিষ্ম আসতে না আসতেই আরো ৪৯ লাখ সৈন্য যুক্ত করে সেনাবাহিনীর কলেবর আরো বৃদ্ধি করা হয়। যুদ্ধের শুরুতে পশ্চিম রণাঙ্গনে বহু ফরাসি সৈন্য হতাহত হওয়ায় তারা আইন করে ৪৫ বছর বয়সী সব ফরাসি নাগরিকের সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করে তোলে। এতে করে সৈন্যসংখ্যা বাড়লেও সেনাবাহিনীর কাঠামো ও ভারসাম্য দ্রুত ভেঙে পড়ে।

১৯১৮ সালের দিকে ফরাসি সৈন্যের ৪০ শতাংশ ছিল গোলন্দাজ। বিশেষ করে ক্রমশ ফরাসি এয়ার সার্ভিস তাদের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত সফল হওয়ায় সৈন্য বাহিনীর কলেবর আর না বাড়িয়ে উদ্যোগ নেয়া হয় বিমান বাহিনী শক্তিশালী করার। তবে নির্বিচারে জোর করে দেশের সব নাগরিককে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা ফরাসিদের সর্বনাশ ডেকে আনে। যুদ্ধে প্রায় ১৩ লাখের মত ফরাসি সৈন্য মারা যায়। ১৯১০-১৪ সালের দিকে এসে ফরাসি নৌবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি তার ব্যয় বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে তোলে। এক্ষেত্রে তাদের বাহিনীতে লভ্য ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও সাবমেরিনের সাথে সাথে যুক্ত হয় ১৪টির মত যুদ্ধজাহাজ, ৩২টি ক্রুজার, ৮৬টি ডেস্ট্রয়ার, ৩৪-সাবমেরিন ও ১১৫টি টর্পেডো বোট। দার্দানেলিস অভিযানের সময় শুরুতেই আক্রান্ত হয়ে ফরাসি বাহিনী পিছু হটে যায়। এরপর ভূমধ্যসাগরে ফরাসি বাণিজ্য জাহাজগুলোর নিরাপত্তা দিতে গিয়েও ব্যর্থ হয় ফরাসি নৌবাহিনী। বিশেষ করে নানা স্থানে শক্তি দেখাতে গিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে হয় জার্মান ইউবোটের। বেশ কয়েকটি স্থানে এই ইউবোটের আক্রমণেরই ছত্রখান হওয়ার যোগাড় ফরাসি নৌবাহিনীর বিপরীতে ধ্বংসের মুখে পড়ে তাদের নৌবাণিজ্য।

তুরস্ক

আরব, আর্মেনীয়, কুর্দি, সিরীয় ও আনাতোলীয় তুর্কি নিয়েই গঠিত হয়েছিল তাদের সেনাবাহিনী। তবে ১৯১২-১৩ সালের দিকে ঘটে যাওয়া বলকান যুদ্ধের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। তারা সেসময়ের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে দেখে পুরো বাহিনীকে ঢেলে সাজানো ছাড়া আরো কোনো পথ নেই। তাদের বন্ধুরাষ্ট্র জার্মানি এবার সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণে সাহায্যের হাত বাড়ায়। বিখ্যাত সমরবিশারদ জেনারেল লিমান ফন স্যান্ডার্স এক্ষেত্রে তুরস্কের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভুত হন। এরপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায় তুর্কি বাহিনী। তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনটি আর্মির অধীনে ৩৬ ডিভিশন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশার নেতৃত্বাধীন তুর্কি বাহিনী নানা স্থানে ইঙ্গো-ফরাসি প্রশিক্ষিত বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। বিশেষ করে গ্যালিপলির যুদ্ধে তুর্কিদের সাফল্য ইংরেজ বাহিনীর মনে ত্রাস সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সবমিলিয়ে তাদের সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার লাখ সৈন্য অংশ নিয়েছিল বলে মনে করা হয়।

অস্টো-হাঙ্গেরিয়ান বাহিনী

যুদ্ধের শুরুটা হিসেব করতে গেলে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির নাম সবার আগে চলে আসে। তাই যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তাদের সৈন্যদলের অবস্থান ও যুদ্ধকালীন সাফল্য গাথা কিংবা ব্যর্থতার খতিয়ান সবই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির আলাদা সেনাবাহিনী থাকলেও তা ১৯১৪ সালের দিকে অর্ধলক্ষ অতিক্রম করতে পারেনি। তবে তাদের বিমান ও নৌবাহিনী বেশ শক্তিশালী ছিল। বলতে গেলে ক্ষুদ্রাকৃতির দেশ হলেও স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে টিকে থাকার ক্ষমতা তাদের ছিলো। এক্ষেত্রে নানা স্থানের রণাঙ্গনে তারা আঘাত হানতে থাকে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ থেকে আক্রমণ চালানোর জন্য। তাদের সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ছিলেন মার্শাল কাউন্ট ফন কনরাড। আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক কনরাডও অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধ বাধার কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন। পাশাপাশি গডউইন ব্রমবোস্কি ছিলেন একজন খ্যাতনামা পাইলট। পরপর প্রায় ৩৫টি যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি হয়ে ওঠেন পুরো সেনাবাহিনীর অনেক পরিচিত মুখ।

সার্বিয়া ও বেলজিয়াম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই বেশ শক্তিশালী ছিল সার্বিয়ান বাহিনী। ১৯০১ সালের দিকে প্রায় সব পরিণত বয়স্ক সার্বিয়ান যুবকের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার কথা বলা হলে মাত্র এক যুগ ব্যবধানে ১৯১২ সালে এসে ২ লাখ ৬০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গড়ে ওঠে তাদের। এরপর তারা মন্টেনিগ্রো, গ্রিস ও বুলগেরিয়ার সাথে যোগদান করে বলকান লীগে। তাদের মিলিত বাহিনী তুর্কি ভূখণ্ডের অনেক এলকা আগ্রাসন চালিয়ে দখল করে নেয়। ৩ লাখ ৬০ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করে প্রথম দিকে বেশ সফলতার সাথে কয়েকটি আক্রমণ তারা প্রতিহত করে। তবে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির দুর্বার আক্রমণের মুখে ধসে গিয়ে ষাটোর্ধ্ব পুরুষদের যুদ্ধে নিয়োগের পাশাপাশি মিত্রবাহিনীর দিকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায় সার্বিয়ানরা।

১৯১৫ সালের ৫ অক্টোবরের দিকে তাদের সহায়তায় এসে পৌঁছায় ফ্রান্স-ব্রিটিশ মিত্রবাহিনীর একটি দল। ব্রিটিশ সেনাদলের নেতা জর্জ মিলনি সেলোনিকা ও ফরাসি দলপতি মরিস সরাই সীমান্তে সরাসরি জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাব্যুহ তৈরিতে অংশ নিয়েছিলেন। তবে ১৯১৫ সালের দিকে জার্মান বাহিনীর দুর্বার আক্রমণে সেখান থেকে মিত্রবাহিনীসহ সার্বিয়ার সৈন্যরা পালিয়ে যায়। তাদের বেশিরভাগ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে গিয়ে আশ্রয় নেয় আলবেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে। সেনাবাহিনীর ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলে বেলজিয়াম ছিল দুর্বল একটি দেশ। তারপর ১৯১৪ সালের দিকে জার্মান আক্রমণে ধসে পড়ে তাদের সীমান্তবর্তী সবগুলো দুর্গ। তাদের ২ লাখ ৬৭ হাজার সৈন্যের মধ্য থেকে প্রায় ১৪ হাজার নিহত ও অগণিত সৈন্য আহত হয়েছিল এ যুদ্ধে।

বুলগেরিয়ার সেনাদল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষমতা প্রদর্শনের মহড়া ও শক্তিমত্তা বিচার করতে গেলে বুলগেরিয়ার সৈন্যদলকে তেমন গুরুত্বের মধ্যে ফেলা যায় না। তবে ২০ থেকে ৪৬ বছর বয়স্ক প্রতিটি পুরুষকে সেনাবাহিনীর ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করার পর ১৯১২-১৩ সালের দিকে ১০ ডিভিশনে উন্নীত হয়েছিল। তারা বলকান ফ্রন্টে সমবেত হয়ে ১৯১৫ সালের দিকে সার্বিয়া আক্রমণ করে বসে। তাদের কোনো কারখানা না থাকার পরেও জার্মান বাহিনীর থেকে সহায়তা পাওয়ায় কখনই গোলাবারুদ, বুলেট, কামান ও মেশিনগান সংকটে পড়তে হয়নি। পাশাপাশি জার্মান আর্মি এয়ার সার্ভিস তাদের লোকবলের পাশাপাশি বিমান দিয়েও সহায়তা করেন। শেষ পর্যন্ত ১২ লাখ বুলগেরিয়ার সৈন্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধবিরতির আগে পর্যন্ত তাদের নিহত সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১ লাখের উপরে।

গ্রিক বাহিনী

বলকান অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হলে গ্রিক রাজার অনুসারী সামরিক কর্মকর্তারা সরাসরি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সমর্থন দিয়ে বসে জার্মানিকে। তখন তাদের সেনা সংখ্যা ৩২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২ লাখ ১০ হাজার করা হয়। তবে এক্ষেত্রে বলকানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে গ্রিক প্রধানমন্ত্রী এলিফথিরিওস ভেনিজেলস অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেই আগ্রহী ছিলেন। তবে রাজা কনস্টান্টাইন ভিন্নমত দেয়াতে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। এদিকে ১৯১৫ সালে ক্ষমতায় গিয়ে তিনি আবার মিত্রবাহিনীর পক্ষে সেনা সমাবেশের চেষ্টা করলে রাজা কনস্টান্টাইন তাকে আবার বরখাস্ত করেন। এরপর তিনি ক্রিট দ্বীপে পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে মিত্রবাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালিয়ে রাজা কনস্টান্টাইনকে পরাজিত করে ক্ষমতা উদ্ধারে সক্ষম হন। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ১৫ হাজার গ্রিক সৈন্যের প্রাণ যায়, পাশাপাশি হতাহত হয় প্রায় এর পাঁচ গুণ।

ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ের বাহিনী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পশ্চিম রণাঙ্গনের পাশাপাশি মেসোপটেমিয়া, গ্যালিপলি, ফিলিস্তিন, পূর্ব আফ্রিকা ও মিশরের নানা স্থানে নিযুক্ত করা হয় ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীকে। ফ্রান্সে পাঠানো ৭০ হাজার ভারতীয় সৈন্যের প্রায় ৫ হাজার নিহত হয়, আহত হয় ১৬ হাজারের বেশি। জেনারেল লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বাধীন এ বাহিনীর সিংহভাগই ছিল ভারতের নানা স্থানে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ব্রিটিশ। পাশাপাশি গোলন্দাজ বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিল বেশ কিছু সংখ্যক জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক। এদিকে ১৯১২ সালের দিকে গঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার বাহিনীতে ৫টি অশ্বারোহী রেজিমেন্টের পাশাপাশি একটি ক্ষুদ্র গোলন্দাজ দল যুক্ত করা হয়। জেনারেল জান স্মার্টসের নেতৃত্বে তাদের প্রায় ১ লাখ ৪৬ হাজার সৈন্য অংশ নেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। এর মধ্যে নিহত ও আহতের সংখ্যাও দশ হাজারের বেশি কিংবা কারো কারো মতে পাঁচ হাজারের মত। এদিকে স্থানীয় শিকারী বয়েড কানিংহামের নেতৃত্বে তৎকালীন রোডেশিয়া তথা জিম্বাবুয়েতে গঠিত হয় বিশেষ বাহিনী। তাদের সিংহভাগ গিয়ে উপস্থিত হয় পশ্চিম রণাঙ্গনে যার বেশিরভাগই ছিল পুরুষ ও ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ।

পাঠ-৩.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের সময়কে বলা হয়ে থাকে সশস্ত্র শান্তির যুগ। কারণ এই সময় প্রায় প্রতিটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র নানাভাবে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর আকার বৃদ্ধির আলেখ্য থেকে দৃষ্টিগোচর হয় যুদ্ধ না হলেও কোনো দেশ নিশ্চুপ বসে থাকেনি। তারা আইন করে নির্দিষ্ট বয়সের মানুষকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে বিশেষ যুদ্ধের প্রস্তুতির ভাব অনেকটাই স্পষ্ট। এসময় বিভিন্ন শক্তিশালী দেশের দখলে থাকা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলো যেমন স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। তেমনি শক্তিশালী দেশগুলোর সন্দেহ, পরস্পর বিশ্বাসহীনতা, ভয়-ভীতি আর স্বার্থপর তৎপরতা বাড়িয়ে তোলে তাদের সম্পর্কের শীতলতা। ১৯ শতকের একেবারে গোড়া থেকে এক দশক নানা কারণে দুটি জোটে বিভক্ত হয়ে যায় পুরো ইউরোপ। এর সাথে যুক্ত হয় পুরো বিশ্বে তাদের সাথে সম্পর্কিত দেশগুলোও। আর সাথে জড়িত কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. **জাতীয়তাবাদ :** ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে যে উগ্র ফরাসি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল তা অনেকাংশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকেও প্রণোদিত করে। বলতে গেলে এর মধ্যদিয়েই অনেক ইউরোপের দেশ স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেস বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তবে ১৮৪৮ সালের পর থেকে শুরু করে ১৮৭০-এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ অর্জন করে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এর মধ্যে ইতালি, জার্মানি, গ্রিস, সার্বিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের কথা বলা যেতেই পারে। পাশাপাশি তাদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ চেষ্টা করতে থাকে স্বাধীন হওয়ার। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে হঠাৎ জাগ্রত হওয়া জাতীয়তাবাদ পুরো ইউরোপকে ঠেলে দেয় এক ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে।

২. **জাতিগত দ্বন্দ্ব :** ইউরোপের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে স্থানীয় পরিসর এবং নানা উপনিবেশে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘাত চলে আসছিল। এরই মধ্যে ঘটে যায় বিখ্যাত সিডানের যুদ্ধ। যুদ্ধের পর ১৮৭১ সালে জার্মানি ফ্রান্সের থেকে লরেন ও আলসেস কেড়ে নেয়। এ দুই এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ফ্রান্সের অধীনে থাকায় নিজেদের ফ্রান্সের অধিবাসী বলে মনে করার পরেও নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে দখল করা হয় স্থান দুটি। অন্যদিকে জার্মান জাতির অংশ ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেও তারা জার্মান এই দাবিও তোলা হয় তখন। এ থেকে ফ্রান্স ও জার্মানির সংঘাত শুরু হয়। পাশাপাশি এমনি নানা অসম্ভব বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে ১৮৭০ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয় ঐক্যবদ্ধ ইতালি। ঐক্যবদ্ধ ইতালির সাথে ট্রেনটিনো ও ট্রিয়েস্টের সংযুক্তীকরণ নিয়ে একটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এ অঞ্চল অস্ট্রিয়ার দখলে থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ইতালির অভিযান হয়ে যায় অবশ্যম্ভাবী। পাশাপাশি বলকান অঞ্চলে জাতিগত দাঙ্গা আরো চাঙ্গা হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।

৩. **উপনিবেশ বৃদ্ধি :** ইউরোপের নানা দেশে শিল্প বিপ্লবের পর নানা ধরনের শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বহুলাংশে বেড়ে যায়। এই বাড়তি পণ্যের বিপনন ও বাজারজাতকরণ নিয়ে ঝামেলায় পড়ে দেশগুলো। তখন নতুন ভূখণ্ড দখলের অন্যরকম এক তাগিদ লক্ষ করা যায় তাদের মধ্যে। তাদের এই দখলবাজির প্রবণতাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৪. **অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদ :** ইউরোপে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মত। অর্থনৈতিক দৈন্য তাদের বিশ্বের নানাদেশে উপনিবেশ স্থাপনে প্রণোদিত করে। এ নিয়েও ইউরোপের নানা দেশের মধ্যে চলত ক্রমাগত সংঘাত। বিশ্বের নানা স্থানে তাদের পণ্যবাজার সৃষ্টি নিয়ে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় এ থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত। এই সংঘাত একদিন অনেক বড় আকার ধারণ করে রূপ নেয় বিশ্বযুদ্ধের। এক্ষেত্রে বিশেষ করে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের কথা বলা যেতে পারে সবার আগে। পাশাপাশি ব্রিটেন অধিকৃত অঞ্চলের দিকে জার্মানির দৃষ্টি গেলে একটি যুদ্ধ হয়ে পড়ে অনিবার্য। আর সবদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অর্থনৈতিক।

৫. **সামরিক শক্তি বৃদ্ধি :** বিশ্বের নানাস্থানে বাজার সৃষ্টি ও বিভিন্ন দেশের সাথে অহেতুক প্রতিযোগিতা বহুগুণে বৃদ্ধি করে প্রতিটি দেশের সামরিক বাহিনীর আকার। বর্ধিত সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন অনেক দেশের পক্ষে এ সংস্থানও সম্ভব ছিল না। তাই যুদ্ধ আর দখলবাজিতে মেতে উঠতে হয় তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই।

তাদের ধারণা ছিল বিভিন্ন দেশের সাথে যুদ্ধে জিততে পারলে তাদের শক্তিমত্তা যেমন বাড়বে তেমনি বিশাল সৈন্যদলের দায়ভারও বইতে হবে না তাদের।

৬. **ইতালি ও জার্মানির একত্রীকরণ :** ইউরোপের দুটি বিশাল ভূখণ্ড হিসেবে ইতালি ও জার্মানির কথা বলা যেতে পারে যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বিভক্ত থাকায় কোনোদিন নিজেদের অবস্থান জানান দিতে পারেনি। বিসমার্ক কিংবা গ্যারিবল্ডি আর কাউন্ট কাভুঁরের মত নেতার কৌশলে একত্রিত হয় জার্মানি ও ইতালি। তারপর থেকে তারা নিজেদের অধিকার প্রসঙ্গে বেশ সোচ্চার থাকেন। এতে করে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর আঁতে ঘা লাগে। তারা বুঝতে শুরু করে ধীরে ধীরে ইতালি কিংবা জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি তাদের জন্য আখেরে মঙ্গল বয়ে আনবে না। আর শেষ পর্যন্ত ইতালি আর জার্মানির বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধটা লেগেই যায়।

৭. **দুর্দমনীয় জার্মানি :** বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড হিসেবে ইউরোপের নানা শক্তির হাতে নিষ্পেষিত ছিল জার্মানি। তারা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর বিসমার্কের নেতৃত্বে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে চলে যায়। একসময় যেসব দেশ তাদের দখল করে রেখেছিল এক্ষেত্রে তাদের শক্তিমত্তা ওই দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। এদিকে দীর্ঘদিন শোষিত জার্মানির মধ্যে তখন কাজ করছে তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা। বিসমার্কের হাত ধরে যে নতুন ঐক্যবদ্ধ জার্মানি আত্মপ্রকাশ করেছিল তা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সময় এসে ইউরোপের দুর্দমনীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ইউরোপের অন্য দেশগুলোর সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি ও সামরিক প্রস্তুতি দেখে তারাও থেমে থাকেনি। একটি পর্যায়ে সবগুলো শক্তিকে একই সাথে চ্যালেঞ্জ করে তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন করে তোলে। বিশেষ করে কাইজার দ্বিতীয় ইউলিয়াম বিসমার্কের নীতি ত্যাগ করেন। তিনি মনে করেন ঐক্যবদ্ধ জার্মানিই সবকিছু নয়। আর এতে করে তিনি জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও বলকান রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি তুরস্ক পর্যন্ত নিজ দখলে নিয়ে গঠন করতে চেয়েছেন নিজস্ব এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য। আর এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তাই তাকে এতটা আগ্রাসী করে তোলে যা আসন্ন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

৮. **অস্ট্রিয়ায় রদবদল :** অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যে দ্বৈত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ সালের দিকে হ্যাপসবুর্গরা তাদের শাসন নীতি পরিবর্তন করে। শাসন ক্ষমতায় জার্মান আভিজাত্যের প্রাধান্য খর্ব করা নিয়ে এসময় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে একইসাথে জার্মান ও অস্ট্রিয়া দুই দেশের অভিজাতদের মানিয়ে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা বেশ কঠিন হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের গৃহীত নানা উদ্যোগ হিসেবে সেখানে জার্মানদের প্রভাব ক্ষুণ্নের চেষ্টা করা হয়। বিভিন্নভাবে দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে স্লাভদের। এভাবে ক্রমাগত স্লাভ অভিবাসন তাদের অভ্যন্তরীণ সংকটকে আরো বড় করে।

৯. **দখলবাজ মনোভাব :** ইউরোপে নানা দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি হেতু তারা পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে প্রতিটি দেশ এবার চেষ্টা করে সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে থেকে যতটুকু পারা যায় নিজ রাজ্য পরিসীমা বাড়িয়ে নেয়া। বিশেষ করে ফ্রান্স ও ব্রিটিশদের নৌপথে যে দীর্ঘদিনের সংঘাত তা আরো বড় আকারে হতে পারত। কিন্তু এবার সময়ের চাহিদায় যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে যায়। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জার্মানি এবং ইতালি নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হাজির হয়।

১০. **চুক্তি ও জোট গঠন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার বেশ আগে থেকেই ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। এসময় নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি তাদের শক্তিমত্তার পাশাপাশি যুদ্ধবাজ প্রবণতাও বাড়িয়ে তোলে বহুলাংশে। এতে করে দেখা গেছে অনেক দুর্বল অর্থনীতির দেশও অহেতুক ক্ষমতা প্রদর্শনের ইচ্ছায় বিশাল সেনা সমাবেশ করে বসে। আর ওই সেনা সমাবেশ তাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে।

১১. **অমীমাংসিত বিরোধ :** ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা কাজ করছিল। ঐতিহাসিকভাবে পরস্পরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দিনে দিনে আরো ভয়াবহ রূপ লাভ করে। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ থেকেই একটি যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে। ভূমি দখল, শক্তি প্রয়োগ আর যুদ্ধবাজ প্রবণতা এই দেশগুলোর সম্পর্কহানির মূল কারণ।

১২. **শাসনগত জটিলতা :** রাজতান্ত্রিক শাসনের ক্রমবিস্তার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনগণের অধিকার বিপন্ন করেছিল। অরাজক পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণকে কোনো একটা কাজে ব্যস্ত রাখাটা তখনকার প্রশাসনের জন্য বেশ জরুরি ছিল। দেশে শিক্ষা, চিকিৎসা আর কর্মসংস্থানের অভাব যখন চরমে তখন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের পিঠ

বাঁচাতে আগ্রহ দেখিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয়। অতিরিক্ত সেনাসদস্য নিয়োগ শাসকদের একটি সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করে। এদিকে সামরিক দিক থেকে বলবান কিন্তু শাসনান্ত্রিক কাঠামোয় জট পাকিয়ে ফেলেছে এমন রাষ্ট্রগুলোর শাসকরা নিজের ক্ষমতা সংহত করতেই পা বাড়ায় ভয়াবহ এ যুদ্ধের দিকে।

১৩. **দ্রুত যুদ্ধ শেষের প্রচারণা :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই এর প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির আপাত হিসাব দেখে অনেক সচেতন ও বিবেকবান মানুষ এর থেকে পিছিয়ে আসতে শুরু করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ তখন প্রচার চালায় যুদ্ধ শুরু হলে তাদের জয়লাভ সময়ের ব্যাপার। আর এক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষই দাবি করে খুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার। আর তারপর জনগণকে নানা সুবিধার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দেয়া হয়। এই প্রচারণাও অনেক দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে প্রণোদিত করে।

১৪. **সিলাইফেনের ভূমিকা :** প্রখ্যাত জার্মান সেনানায়কের নাম আলফ্রেড গ্রাফ ফন সিলাইফেন। তিনি বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে প্ররোচিত করেন। বিশেষ করে তিনি ১৯০৫ সালের দিকে অবসর গ্রহণের পূর্বে জার্মানির উন্নয়নে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করে যান। এক্ষেত্রে ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া হার মানলে তার প্রস্তাবনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যা প্ররোচিত করে অন্যসব যুদ্ধবাজ জার্মান সেনানায়ককে। প্রাথমিকভাবে অনেক দুঃসাহসী এ পরিকল্পনাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

১৫. **ভিয়েনা কংগ্রেস :** ফ্রান্স আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফরাসি বিপ্লব যেমন ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস ও মানচিত্র বদলে দিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। তেমনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় ইউরোপের ইতিহাসকে প্রবাহিত করে ভিন্ন খাতে। যুদ্ধজয়ী ব্রিটেন, প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া এ সম্মেলনের আয়োজক ছিলো। এক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী মেটারনিক পুরো ইউরোপকে জোর করে ঠেলে ফরাসি বিপ্লব-পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাবনা পেশ করে। এ প্রস্তাবনাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

১৬. **ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়া যুদ্ধ :** ১৮৭০-৭১ সালের দিকে অনুষ্ঠিত ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়া যুদ্ধ ইউরোপের শক্তিসাম্য নষ্ট করে। নিকট ভবিষ্যতে এ ভারসাম্যহীনতা বিভিন্ন শক্তিশালী দেশকে নিপীড়নকারী ও ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করে। শেষ পর্যন্ত এই শক্তিসাম্য নষ্টের ঘটনা অনেক দিক থেকে বিশ্বযুদ্ধকে প্রণোদিত করেছে।

১৭. **বিসমার্কের দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি :** কুশলী নেতা ও সমরনায়ক অটো ফন বিসমার্কের নেতৃত্বে পতনোন্মুখ জার্মানি ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে। তারা অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির সাথে জোট গঠন করে শক্তিমত্তা আরো বাড়িয়ে তোলে। পাশাপাশি রশিয়ার সাথে সফল কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারায় জার্মানির শক্তিমত্তা বেড়ে যায়। তিনি ফ্রান্স ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। এজন্যই হয়ত ফ্রান্স জার্মানির প্রতি বিরূপ অবস্থান দেখিয়ে আসছে দীর্ঘদিন। এ দ্বিপক্ষীয় চুক্তির দুর্বলতা ও জার্মানির দ্রুত শক্তিবৃদ্ধির হেতু একটাই, যুদ্ধ জড়িয়ে পড়া।

১৮. **কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম :** একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া ইউরোপের প্রায় সবগুলো দেশের সাথে চুক্তি করেছিলেন বিসমার্ক। তিনি জানতেন চুক্তি করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি না করে অহেতুক যুদ্ধে জড়ালে শিশু জার্মানির পক্ষে তখনকার ইউরোপে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। তবে কাইজার দ্বিতীয় ইউলহেম ক্ষমতায় বসলে তার অদূরদর্শিতা বিসমার্ককে ত্যক্ত বিরক্ত করে। তিনি ১৮৯০ সালে পদত্যাগ করলে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম আরো অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন। তিনি সাগরে ইংরেজ বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার মত আরেকটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন। নৌবাহিনীর দিক থেকে জার্মানির এমন শক্তিশালী অবস্থানে চলে যাওয়া ১৯০৪ সালের দিকে অ্যাংলো-ফরাসি জোট গঠনে বাধ্য করে। এরপর জোট আরো শক্তিশালী করে তুলতে ১৯০৭ সালে তারা রাশিয়াকে নিজেদের সাথে যুক্ত করে।

১৯. **জার্মান-ইংরেজ নৌবহর :** কাইজার দ্বিতীয় উইলহেমের উত্থানের আগে সাগরে অপ্রতিরোধ্যভাবে রাজত্ব করত ইংরেজ নৌবাহিনী। তারা পর পর বেশ কয়েকটি নৌযুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি সাগরের ত্রাস হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঠিক এমনি পরিস্থিতি কাইজারের পক্ষ থেকে জার্মান নৌবাহিনী গঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন গ্রান্ড অ্যাডমিরাল অ্যালফ্রেড ফন টার্পিজ। ১৮৯৮-১৯১২ সালের মধ্যে তাঁর প্রচেষ্টায় জার্মান নৌবাহিনী ইংরেজদের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে লড়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এদিকে ফার্স্ট সি লর্ড জ্যাকি ফিশার নতুন করে ঢেলে সাজান ইংরেজ নৌবাহিনীকে। দুই দেশের

নৌবাহিনীর শক্তিমত্তা বৃদ্ধি নতুন করে আরেকটি সংঘাতে জড়াতে প্রণোদিত করে যাকে প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম পরোক্ষ কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

২০. **ক্রমবর্ধমান সামরিকবাদ :** ১৯০৪ সালের পর ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশ সেনাবাহিনীর আকার বৃদ্ধি করে। এ বর্ধিত সেনাবাহিনী তাদের কৃতকর্মের জন্য কোনো নির্বাচিত সরকার নয় বরং দায়ী থাকতো সম্রাটের কাছে। বেশিরভাগ যুদ্ধবাজ সম্রাট চাইতেন যেভাবেই হোক শান্তিতে-অশান্তিতে তার রাজ্যসীমা কিঞ্চিত হলেও বৃদ্ধি পাক। এ নীতি বুঝতে পেরে সামরিক বাহিনীর প্রধানরা বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। তাদের অহেতুক যুদ্ধবাজ নীতিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচ্য।

পাঠ-৩.৪ বিভিন্ন রণক্ষেত্রের সংঘাত

সামরিক বেসামরিক মিলে প্রায় দেড় কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। প্রায় ৯০ লাখ সামরিক ও ৭০ লাখ বেসামরিক মানুষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয়েছিল। রুশ গৃহযুদ্ধ এবং আর্মেনীয় গণহত্যার কাহিনীকে বাদ দিলেও এ যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যায় তেমন কোনো হেরফের হয় না। বলতে গেলে ১৯১৪ সালের ২১ আগস্ট ব্রিটিশ এক্সপিডিশনারি ফোর্সের চতুর্থ ড্রাগন গার্ডসের ১২০ জন অশ্বারোহী সৈন্য গিয়ে অবস্থান নেয় বেলজিয়ামের চ্যাস্টাউ গ্রামে। সেখানে জার্মান সৈন্যদের জোরদার অবস্থান দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি ১৬ বছর বয়স্ক কিশোর ব্রিটিশ সৈন্য বেন ক্লাউটিং। ২২ আগস্ট তাঁর ছোড়া গুলির মধ্য দিয়েই মূলত হয়ে শুরু যায় এ যুদ্ধ। তারপর এগিয়েছে নানা সংঘাত আর ঘটনার ঘনঘটায়, সেগুলোর মধ্যে থেকে কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করা হল–

রণাঙ্গনে প্রথম লড়াই

১৯১৪ সালের ৩ আগস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সীমান্ত লংঘনের অভিযোগ এনে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় জার্মানির পক্ষ থেকেই। পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান ও ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ বাহিনীর সৈন্য সমাবেশ যেকোনো মুহূর্তে প্রলয়ঙ্করী সংঘাত বাধার কথা জানান দেয়। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয়নি জার্মানরা। তারা একইসাথে বেলজিয়ামেও সৈন্য প্রেরণ করে। ৪ আগস্ট ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও শুরুতেই তারা শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাদের শান্তি আলোচনার প্রস্তাব আমলে না দিয়ে দুর্নিবার আক্রমণ চালিয়ে মাত্র ৩ দিনের মাথায় লাইজি দখল করে বেলজিয়ামের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। পুরো বেলজিয়াম দখলে নিতে জার্মানির ১৮ আগস্ট পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এর মাত্র দুদিন পর জার্মান বাহিনীর আক্রমণ লোরেন থেকে ফরাসিদের পিছু হটতে বাধ্য করে। ২২-২৫ আগস্ট পাল্টা হামলার চেষ্টা করেও নিউচাটাও ও লংওয়ের লড়াইয়ে বিধ্বস্ত হয় ফরাসিরা।

ব্রিটিশ-জার্মান মুখোমুখি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম লড়াই শুরু হয় ব্রিটিশ ও জার্মান সৈন্যদের পরস্পর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে। বেলজিয়ামের পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্রিটিশ ও জার্মান সৈন্যরা সমবেত হয়। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ এক্সপিডিশনারি ফোর্সের সৈন্যরা ৭০ হাজারের একটি দল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় ১৪ আগস্ট। এরপর তাদের সাথে গিয়ে যোগদান করে ফরাসি জেনারেল লানরেজাসের নেতৃত্বাধীন ফিফথ আর্মি। এসময় ফিল্ড মার্শাল ফ্রেঞ্চ জেনারেল স্মিথ ডোরেন ও হেইগের নেতৃত্বে পশ্চিমের প্রায় ৪০ কিলোমিটার রণাঙ্গনে সমবেত হতে থাকে সৈন্যরা। আর তাদের প্রতিরোধে উপস্থিত হয় জেনারেল ফন ক্লার্কের নেতৃত্বাধীন চৌকস জার্মান সৈন্যের একটি দল। তিনি শুরুতে ব্রিটিশ সৈন্যদের ধাওয়া করেন। পরে আক্রমণ বন্ধ করে সংখ্যা পূরণ করার চেষ্টা করেন।

সার্বিয়া অভিমুখে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির বাহিনী

গ্রিস, সার্বিয়া ও আলবেনিয়ার সংঘাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে অন্যতম। সার্বিয়ার অস্ট্রো-হাঙ্গেরির আক্রমণ বলতে গেলে এ সময়ে যুদ্ধের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ১৯১৪ সালের আগস্টে যুদ্ধ শুরু হলে এর শেষ তথা ১৯১৮ সাল নাগাদ চলতে থাকে এ দু'পক্ষের লড়াই। মার্শাল রাদোমিক পুতনিকের নেতৃত্বাধীন সার্বিয়ার সৈন্যদের সাথে যুক্ত হয়েছিল মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা। এদিকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির পাশাপাশি বেলজিয়ামের সৈন্যরা সেখানে প্রথম অভিযান চালায় জেনারেল অস্কার পোটিওরেকের নেতৃত্বে। যুদ্ধে শুরুতে জেনারেল রামোমির পুতনিকের নেতৃত্বাধীন সার্বিয়ার সৈন্যসংখ্যা মাত্র ২ লাখ ছিল। তখন অস্ট্রিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁকে গ্রেফতার করে অস্ট্রীয় বাহিনী। তবে তাঁকে চিনতে না পেরে চরম বোকামির পরিচয় দিয়ে একটি ট্রেনে করে সার্বিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়। তারপর সার্বিয়ায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরির আক্রমণ হলে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। ভয়ানক অসুস্থ শরীর নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সার্বিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করেন মার্শাল রাদোমির পুতনিক। ২১ আগস্ট দ্রিনা নদী অতিক্রমের পর শুরু হয় মরণপণ লড়াই। তখন একজন অসুস্থ সেনানায়ক পুতনিক জেনারেল অস্কার পোটিওরেকের চৌকস বাহিনীকে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেন প্রতিরোধ লড়াই কাকে বলে। পুতনিকের যোগ্য নেতৃত্ব এবং অসুস্থ অবস্থায়ও দেশের প্রতি সীমাহীন আন্তরিকতা সার্বিয়ার বাহিনীকে পথ দেখায়। তারা প্রতিপক্ষের দ্রিনা ও সাভা নদী পার হওয়ার সব ধরনের চেষ্টা নস্যাৎ করে নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দেয়।

পূর্ব রণাঙ্গনের লড়াই

মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দিকে বিস্তৃত পূর্ব রণাঙ্গন পশ্চিম থেকে আলাদা ছিল। এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান যুদ্ধ এগিয়ে নেয়ার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পশ্চিম রণাঙ্গনের লড়াইয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে পরিখার লড়াই বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। তবে পূর্ব রণাঙ্গনের দীর্ঘ বিস্তৃত ও এবড়ো থেবড়ো ভূ-প্রকৃতির কারণে এখানে কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা গড়ে ওঠেনি। পাশাপাশি এখানকার দীর্ঘ বিস্তৃতি হেতু প্রতিরক্ষা রেখা বরাবর সৈন্য মোতায়েনের ঘনত্বও ছিল বেশ কম। এক্ষেত্রে একবার কোনোক্রমে প্রতিরক্ষাব্যুহে ফাটল দেখা দিলে তা পুষিয়ে নেয়া বেশ কঠিন ছিল। পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন সুগঠিত না হওয়ায় একবার সৈন্যবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হলে নতুন করে সৈন্য এনে ক্ষতিপূরণ করটাও ছিল বেশ কঠিন একটা কাজ। এখানে প্রতিরোধ লড়াই যতটা সহজ ছিল বাইরে থেকে আক্রমণ করে সুবিধা অর্জন ছিল ঠিক ততটাই কঠিন। বলতে গেলে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এখানে জার্মান বাহিনীই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। রুশ সেনাবাহিনী প্রথম পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ করে। তারা প্রুশিয়ার একটি প্রদেশ এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরির গ্যালিসিয়া প্রদেশে হামলা করার চেষ্টা চালালে পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ বাধে। তবে ১৯১৪ সালের আগস্টে টানেনবার্গের লড়াইয়ে তাদের বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে। একই বছরের শরৎ আসতে না আসতেই তারা হানা দেয় গ্যালিসিয়ায়। এক্ষেত্রে তাদের দ্বিতীয় অভিযানকে অনেকাংশেই সফল বলা যেতে পারে। তারপর সেপ্টেম্বরে লাম্বার্গ যুদ্ধে জয়ী হয়ে ক্রাকো ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সীমান্ত দুর্গ পারমিজাইলে অবরোধ শুরু করে।

টানেনবার্গের সংঘাত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একেবারে সূচনাপর্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা টানেনবার্গের যুদ্ধ। জার্মানির টানেনবার্গে অনুষ্ঠিত এ লড়াইয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রুশরা। রাশিয়ার পক্ষে আলেকজান্ডার সামসোনভ তার ১ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে জেনারেল পল ফন হিন্দেনবার্গের ২ লাখ ১০ হাজার প্রশিক্ষিত সৈন্য রুশ বাহিনীকে ছত্রখান করে দেয়। জার্মান পক্ষে ২০ হাজার নিহত হলেও তারা ৩০ হাজার রুশ সৈন্যকে হত্যার পাশাপাশি ৯৫ হাজার সৈন্যকে বন্দি করে। রুশ সাম্রাজ্য ও জার্মান রাইখের এ লড়াই অনেকাংশে যুদ্ধে জার্মানদের আরো অনুপ্রাণিত করেছিল। এখানে অষ্টম জার্মান আর্মির সঙ্গে রুশদের ফার্স্ট ও সেকেন্ড আর্মির সংঘাত বাধলে রুশ সেকেন্ড আর্মি প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসে। ১৯১৫ সালের বসন্তকাল আসা পর্যন্ত এ লড়াইয়ে রুশরা আর কিছুতেই ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। বিশেষ করে যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই জার্মানরা রাশিয়াকে তাদের জন্য হুমকি মনে করত। এ লড়াইয়ের মাধ্যমে তারা রণাঙ্গনে তাদের প্রথম শত্রুকে চাপে রাখতে চেয়েছিল। আর যুদ্ধের প্রাথমিক ফলাফল হিসাব করা হলে এ এক্ষেত্রে জার্মানিকেই পুরোপুরি সফল বলাটা কোনোদিক থেকেই দোষের হবে না।

পারমিজাইল দুর্গ অবরোধ :

১৯১৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে পারমিজাইল দুর্গ অবরোধ শুরু করে রুশ বাহিনী। এ অবরোধে রুশদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন তৃতীয় আর্মির কমান্ডার জেনারেল রাডকো দিমিত্রভ। অবরোধের শুরুতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কামান না থাকায় তিনি একদফা হোঁচট খান। ১১ অক্টোবর পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির বাহিনী। এদিকে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে ৯ নভেম্বর থেকে দুর্গ অবরোধ শুরু করে রুশরা। তখন দিমিত্রভের বাহিনীর কাছে পর্যাপ্ত কামান এসে না পৌঁছলেও তিনি বাহিনীকে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এদিকে পারমিজাইল দুর্গে রুশ অবরোধ দেখে জার্মানরাও থেমে থাকেনি। এসময় জেনারেল ফন ফন হিন্দেনবার্গ উত্তর দিকে ওয়ারশতে হামলা চালান। আর এর সাথে মিল রেখে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির জেনারেল বারোয়িভিক ফন বোজনা দুর্গকে সহায়তা করতে পারমিজাইলের দিকে অগ্রসর হন। মূলত তিনি এগিয়ে আসাতেই দিমিত্রভ অবরোধ প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছিলেন। অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সমর নেতা জেনারেল কাউন্ট ফন কনরাড ভেবেছিলেন ফন বোজনার আক্রমণেই কুপোকাত হয়ে যাবে রুশ বাহিনী। তবে ৩১ অক্টোবরে ভিশ্চুলা নদীতীরের লড়াইয়ে রুশ বাহিনী হিন্দেনবার্গের চৌকস সেনাদলকে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ে। এতে ফন কডরাডের সব চিন্তা ধূলিসাত হয়ে যায়। তবে দুই পক্ষ থেকে তেমন কোনো ছাড় দেয়ার মানসিকতা লক্ষ করা যায়নি। তাই ১৯১৫ সালের ২২ মার্চ দুর্গ পতন পর্যন্ত প্রায় ১৯৪ দিনের লড়াই চলে দু'পক্ষে।

ব্রাসিলভের লড়াই

১৯১৬ সালের গ্রীষ্মকাল মিত্রবাহিনীর জন্য এক নাজুক সময়। তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্রিটিশ হামলার ধার অনেকটাই কমে যায়। বিশেষ করে জার্মান বাহিনীর মুহুর্মুহু আক্রমণে ছত্রখান হওয়ার দশা হয় তাদের। এসময় উপায় না দেখে রুশদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে মিত্রবাহিনী। বিশেষ করে ভার্দুনে অবস্থানরত ফরাসি বাহিনী জার্মান আক্রমণে প্রায় দিশেহারা অবস্থায় পড়ে। তারা মনে করে এসময় রুশরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলে অন্তত এ যাত্রা রক্ষা পাবে তারা। এ ধরনের নানা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রুশ জেনারেল অ্যালেক্সি ব্রাসিলভের নেতৃত্বে পূর্ব রণাঙ্গনে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে শুরু হয় রুশ অভিযান।

ব্রাসিলভের নামানুসারে এ অভিযানের নাম দেয়া হয় 'ব্রাসিলভ অফেনসিভ'। রুশ জেনারেল স্টাফ স্টাভকার সামনে ব্রাসিলভ একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। সেখানে তার অভিযানের লক্ষ ছিল ফ্রান্সে ফরাসি ও ব্রিটিশ বাহিনীর পাশাপাশি আইসনজো ফ্রন্টে ইতালীয় বাহিনীর ওপর থেকে চাপ কমিয়ে আনা। অন্যদিকে যেভাবেই হোক অস্ট্রো-হাঙ্গেরিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দেয়া। এক্ষেত্রে জার্মানরা পরিস্থিতি বুঝতে পেরে পূর্ব রণাঙ্গনেও সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। এ হামলায় রুশদের পক্ষে প্রচুর হতাহত হলেও ফলাফল মিত্রবাহিনীর পক্ষে নিয়ে আসে। বিশেষ করে এ হামলার মধ্য দিয়েই টনক নড়ে জার্মানদের, তারা পশ্চিম রণাঙ্গনে সব সৈন্যের সমাবেশ না করে তাদের অনেকগুলো ইউনিটকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মোতায়েন করে পূর্ব রণাঙ্গনেও। এতে আর যাই হোক তাদের হামলার ধার কমে যায় অনেকাংশে।

ভয়াবহ পশ্চিম রণাঙ্গন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ লড়াইগুলো হয়েছিল পশ্চিমের রণাঙ্গনেই। এক্ষেত্রে উত্তর সাগর থেকে শুরু করে ফ্রান্সের সীমান্তঘেঁষে সুইজারল্যান্ডের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এ রণাঙ্গন। প্রথম দিকে জার্মান বাহিনী কিংবা মিত্রবাহিনী কারো দিক থেকেই কোনো ধরনের দুর্বলতা লক্ষ করা যায়নি। দুপক্ষেই প্রচুর হতাহত হলেও শেষ পর্যন্ত নতুন সৈন্য এনে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা লক্ষ করা গেছে তাদের মধ্যে। ব্রিটেনের নেতৃত্বে বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র এখানে মার্শাল ফার্দিনান্দ ফচের নেতৃত্বে মোকাবেলা করে জার্মানদের। এদিকে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই ফ্রন্টের লড়াইয়ে। শেষ পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর তরফ থেকে ৪৮ লাখ হতাহতের কথা বলা হলেও জার্মান বাহিনী তাদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির উপযুক্ত সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারেনি। তবে যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত বেলজিয়ামের বেশিরভাগ এলাকা, লুক্সেমবার্গ ও ফ্রান্সের শিল্পাঞ্চলগুলো ছিল জার্মানির দখলেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গের পর ফ্রান্সে নিজেদের অগ্রযাত্রাকে ধারাবাহিক করে জার্মান বাহিনী। তবে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল নাগাদ এ ফ্রন্টে পরপর কয়েকটি প্রাণঘাতী লড়াই হয়। দলবদ্ধ পদাতিক বাহিনীর হামলার পাশাপাশি ব্যাপক কামানের গোলাবর্ষণ করা হয় দুই বাহিনীর পক্ষ থেকেই। কাঁটাতারের শক্ত বেষ্টনীর পাশাপাশি পরিখা খনন করে আগে থেকেই উপযুক্ত অবস্থান নিয়ে বসে থাকে জার্মান বাহিনী। পাশাপাশি পথগুলো আরো নিরাপদ করতে নির্দিষ্ট দূরত্বে মাইন পুঁতে রাখে জার্মানরা। তাই অনবরত মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়তে থাকলেও শেষ পর্যন্ত জার্মানদের তেমন কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি মিত্রবাহিনী। পশ্চিম রণাঙ্গনের এ অচলাবস্থা কাটাতে মরিয়ে হয়ে ওঠে মিত্রবাহিনী। তারা শেষ পর্যন্ত এখানে বিষাক্ত গ্যাসবোমা হামলা করে। পাশাপাশি জঙ্গবিমান থেকে চলতে থাকে লাগাতার বোমাবর্ষণ।

আটলান্টিকের ত্রাস জার্মান ইউবোট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে ইউরোপের প্রতিটি দেশ সমীহ করে চলতে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে দেখা যায় এক ভিন্ন চিত্র। ১৯১৪ সালের দিকে উদ্ভাবিত জার্মান ইউবোট এক্ষেত্রে হঠাৎ করেই আটলান্টিকের অতলে ত্রাস সৃষ্টি করে। জার্মান শব্দ 'আন্ডারসিবোটভাভি' থেকেই এ ইউবোটের নামকরণ যা পানির তলদেশ দিয়ে আক্রমণ চালাতে অনেক কার্যকর একটি

জার্মান ইউবোট

সাবমেরিন। ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক দুদিন পর তৎপরতা শুরু করে এ ইউবোট। ১৯১৪ সালের ৬ আগস্ট হোলিগোল্যান্ডে অবস্থিত নৌঘাঁটি থেকে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির ওপর আক্রমণ শানাতে যাত্রা করে ১০টি জার্মান ইউ বোট। ইতিহাসে প্রথমবারের মত সাবমেরিন টহল শুরু হলে মাইনের আঘাতে কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ১৯১৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে সফলতার মুখ দেখে ইউবোটগুলো। লেফটেন্যান্ট অটো হার্সিং ইউ-২১ থেকে টর্পেডো নিক্ষেপ করে ব্রিটিশ ক্রুজার পাথফাইন্ডারকে ডুবিয়ে দেয়। এতে ২৫৯ জন ক্রুর কেউই প্রাণরক্ষা করতে পারেনি। এদিকে ২২ সেপ্টেম্বর লেফটেন্যান্ট অটো ওয়েডিগেন ইউ-৯ তিনটি ব্রিটিশ ক্রুজারে প্রাণঘাতী হামলা চালান। এতে তিনটি ব্রিটিশ ক্রুজার আবুকির, ক্রেসি ও হগ পুরোপুরি পানিতে ডুবে যায়। মাত্র আধঘণ্টার এ লড়াইয়ে প্রায় ১ হাজার ৪৬০ জন ব্রিটিশ নাবিক প্রাণ হারায়। এরপর আরো কয়েকটি হামলা চালিয়ে এককথায় আটলান্টিকের ত্রাস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জার্মান ইউবোট।

অন্তরীক্ষেও দুর্নিবার যুদ্ধ

প্রথম দিকে পদাতিক বাহিনী যুদ্ধ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিমান বাহিনী এর শৈশব অতিক্রম করছে মাত্র। প্রথম দিকে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের জন্য ক্যাম্বিস ও কাঠের তৈরি বিমানগুলোকে ব্যবহার করা হয়। খুবই ধীরগতির কিছু জেপেলিন ও বেলুন এক্ষেত্রে বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। প্রথম দিকে শুধুমাত্র শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে সংবাদ বিনিময় শুরু হলেও পরের দিকে ইট থেকে শুরু করে গ্রেনেড নিক্ষেপ শুরু হয় বিমান থেকে। প্রথম দিকে দুর্বল শক্তির মরিস ফারম্যান, শর্টহর্ন, লংহর্ন, ডিএফডব্লিউবি-১, র‍্যামপ্লার টাউব, বিই-২-এ, এইজি সেকেন্ড, ব্লেরিয়ট ইলেভেন প্রভৃতি বিমান ব্যবহার করা হয়। ধীরে যুদ্ধ এগিয়ে যাওয়া অবস্থায় বিমানের গঠন কাঠামোতে অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়। বিশেষ করে ১৯১৫ সালে জার্মানির উদ্ভাবিত ফকার বিমান মিত্রবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। প্রায় ১১০০ ফুট উচ্চতা দিয়ে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রমে সক্ষম এই বিমান বলতে গেলে মিত্রবাহিনীর জন্য মহাবিপর্যয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়। ১৯১৭ সালের দিকে বিমান হামলা ভয়াবহরূপ লাভ করলে ব্রিটিশ বাহিনী তাদের ২৪৫টি বিমান হারায়। এক্ষেত্রে জার্মান বাহিনীর ক্ষতি হয় ৬৬টির মত বিমান। সবমিলিয়ে আকাশপথেও চলতে থাকে ভয়াবহ যুদ্ধ।

ট্যাংকের লড়াই

পশ্চিম রণাঙ্গনের ব্যর্থতা ব্রিটিশদের উন্নততর প্রযুক্তির সামরিক যান ও কৌশলগত অবস্থান গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। উপনিবেশ স্থাপন থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পেছনের দরজা যে ব্রিটিশদের প্রথম পছন্দ এবারেও তারা তেমন কোনো পদ্ধতি খুঁজতে চেষ্টা করে। তারা একইসাথে কাঁটাতারের বেড়া ধ্বংসের পাশাপাশি মেশিনগানের গুলি থেকে বেঁচে পরিখা অতিক্রমে সক্ষম যানবাহন তৈরি করে। এক্ষেত্রে কর্নেল আর্নেস্ট সুইনটনের নির্দেশনায় কাজে নেমে পড়ে ল্যান্ডশিপস কমিটি। তাদের দীর্ঘদিনের চেষ্টায় নির্মিত হয় লিটল উইলি নামক ট্যাংক। এক্ষেত্রে ব্রিটিশরা দুই মেইল ও ফিমেইল নামে দুই ধরনের ট্যাংক উদ্ভাবন করে। তারা দুইটি সিক্স পাউন্ডার গানের পাশাপাশি ৪টি মেশিনগান সজ্জিত ট্যাংকের নাম দেয় মেইল। অন্যদিকে সিক্স পাউন্ডারের পাশাপাশি ভাইকার্স মেশিনগান যুক্ত ট্যাংকে ফিমেইল নাম দেয়। বলতে গেলে পশ্চিম রণাঙ্গনের ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনীর হাজার হাজার ট্যাংক এক্ষেত্রে অনেক কার্যকর হয়ে ওঠে। বলতে গেলে শুরুতে এ ট্যাংকের লড়াইতেই তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি শক্তিমান জার্মান বাহিনী। তবে পরিখা সুবিধা কাজে লাগিয়ে গতি শ্লথ করে দেয়ার পাশাপাশি জার্মানরাও বসে থাকেনি। তারা আবিষ্কার করে বসে ট্যাংক বিধ্বংসী নানা অস্ত্র। শেষ পর্যন্ত জার্মানরা তৈরি করে প্যাক ৪০-৭৫এমএম গান। বিশাল ক্যালিবারের এ গোলা যেকোনো ট্যাংকর ধ্বংস করে দিত।

অনৈতিক রাসায়নিক অস্ত্র

পশ্চিম রণাঙ্গনের দখল নিয়ে প্রতিযোগী দেশগুলোর অনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। পরিখা তৈরি করে বছরের পর বছর নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে জার্মান বাহিনী। শেষ পর্যন্ত তাদের পিছু হটাতে জঘন্য রকমের গন্ধযুক্ত ক্লোরিন গ্যাসবোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে চোখ জ্বালাপোড়া করার পাশাপাশি সৈন্যদের আরো নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। উপযুক্ত জবাব দিতে জার্মানিও চালায় মাস্টার্ড গ্যাসবোমা হামলা। চামড়ায় যন্ত্রণাদায়ক দহন ও কাপড়চোপড় ভেদ করে ভেতরে গিয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়ে দেখা এই গ্যাস। সবমিলিয়ে এই গ্যাসবোমার হামলা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও মানবতা বিবর্জিত হলেও তা শাপে বর হয়ে দেখা দেয় মিত্রবাহিনীর জন্য। বিশেষ করে বেশিরভাগ গ্যাস ছিল বাতাসের চেয়ে ভারী। এগুলো গিয়ে বিভিন্ন জার্মান বাংকারে জমা হয়। সেখানে শুধুমাত্র যন্ত্রণাদায়ক গ্যাসের জন্য অনেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়

জার্মান বাহিনী। অন্যদিকে কিছু বিষাক্ত গ্যাস পানিতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। অনেক প্রাণি মারা যাওয়ার পাশাপাশি পানযোগ্য পানির অভাবেও ধুঁকতে থাকে শক্তিশালী জার্মান বাহিনী। অন্যদিকে গ্যাসবোমায় আক্রান্ত হয়ে মিত্রবাহিনীরও ক্ষয়ক্ষতি কম হয়নি। অসেক ক্ষেত্রে গ্যাসবোমার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা নির্ভর করত বায়ুপ্রবাহের ওপর। বিশেষ করে বাতাসের উল্টোদিকে গ্যাসবোমা নিক্ষিপ্ত হলে তার থেকে নিজেদের রক্ষা করা অনেক কঠিন হয়ে যেত। পক্ষান্তরে দূর থেকে কুণ্ডলি পাকানো গ্যাসের মেঘ থেকে শত্রু পক্ষ সাবধান হয়ে যায়। তবে পরবর্তীকালে ফরাসিরা কামানের গোলায় ভরে ফসজেন গ্যাস নিক্ষেপ করা শুরু করে। এতে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যায়।

ইপ্রেঁর যুদ্ধ

অন্যতম আলোচিত যুদ্ধক্ষেত্র ইপ্রেঁতে পরপর তিনটি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোকে ইপ্রেঁর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধ হিসেবে ইতিহাসে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। মহাযুদ্ধের প্রথম বছরের দীর্ঘতম এবং ভয়াবহ লড়াই হিসেবে ইপ্রেঁর প্রথম যুদ্ধের কথা বলা যেতে পারে যা ব্যাটল অব ফ্লান্ডার্স নামেও পরিচিত। এক্ষেত্রে মিত্রবাহিনীর বিজয় হলেও দু'পক্ষে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৯১৪ সালের ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত চলা এ যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর নেতৃত্ব দেন জন ফ্রাঞ্চ ফার্দিনান্দ ফচ। যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স মিলিয়ে মিত্রবাহিনীর লক্ষাধিক সৈন্যের প্রাণহানি ঘটে। অন্যদিকে এরিক ফন ফাকেনহায়েনের নেতৃত্বাধীন জার্মান বাহিনীর বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাদের চতুর্থ ও ষষ্ঠ আর্মি থেকে সবমিলিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার সৈন্যের প্রাণহানি হয়। এদিকে ১৯১৫ সালের ২২ এপ্রিল আবার লড়াই বাধে বেলজিয়ামের ইপ্রেঁ যুদ্ধক্ষেত্রে যা ২৫ মে পর্যন্ত স্থায়ী হয়। হোরেস স্মিথ ডোরেনের নেতৃত্বে মিত্রবাহিনীর ৮টি পদাতিক ডিভিশন এতে অংশ নেয় যাদের ৭০ হাজার হতাহত কিংবা নিখোঁজ হয়। অন্যদিকে জার্মানির পক্ষে ৭টি পদাতিক ডিভিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অলব্রেচট অব ওয়ার্টেম্বার্গ যার থেকে ৩৫ হাজার সৈন্য হতাহত কিংবা নিখোঁজ হলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ থাকে অমীমাংসিত। এদিকে ১৯১৭ সালের ৩১ জুলাই বেলজিয়ামের পশ্চিম ফ্লান্ডার্সে নতুন করে শুরু হয় ইপ্রেঁর তৃতীয় লড়াই। এতে বিশালাকার মিত্রবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন চারজন কুশলী সেনানায়ক জেনারেল ডগলাস হেইস, জেনারেল হুবার্ট গাফ, জেনারেল হার্বার্ট প্লামার ও জেনারেল আর্থার কুরি। অন্যদিকে জেনারেল ম্যাক্স ফন গ্যালউইজ ও জেনারেল এরিক লুডেনডর্ফের নেতৃত্বে অংশ নেয় শক্তিশালী জার্মান বাহিনী। শেষ পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর ৪ লাখ ৪৮ হাজার এবং জার্মানদের ২ লাখ ৬০ হাজার হতাহত হলেও যুদ্ধের ফলাফল ছিল অমীমাংসিত।

মারনির সংঘাত

ভয়াবহ পশ্চিম রণাঙ্গনের একক বৃহত্তম যুদ্ধ হিসেবে মারনির সংঘাতের কথা বলা যেতে পারে। এই লড়াইয়ে মিত্রবাহিনীর জয়ের মধ্য দিয়ে বলতে গেলে অনেক দিক থেকে যুদ্ধে স্থবিরতা লক্ষ করা গেছে। এতে দ্রুত জয়লাভের আশা বাদ দিয়ে জার্মান বাহিনী দুই রণাঙ্গনে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। রুশ জেনারেল সিলাইফেনের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনী তাদের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখে। ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন দুজন কুশলী সেনানায়ক ফিল্ড মার্শাল স্যার জন ফ্রেঞ্চ ও জেনারেল জোসেফ জোফরে। তাঁদের নেতৃত্বে প্যারিসের মারনি নদীর তীরে প্রায় ১০ লাখ ৭০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে মিত্রবাহিনী। মিত্রবাহিনীকে উপযুক্ত জবাব দিতে তিনজন জার্মান সমরনায়ক জেনারেল হেলমুট ফন মোল্টকি, জেনারেল কার্ল ফন বুলো, জেনারেল আক্সাান্ডার ফন ক্লাকের প্রায় ১৪ লাখ ৮৫ হাজার সৈন্য এতে জড়ো করে জার্মান বাহিনী। এতে মিত্রবাহিনীর ৩ লাখ ৬৩ হাজার সৈন্যের পাশাপাশি জার্মান পক্ষে হতাহত হয় প্রায় আড়াই লাখ সৈন্য।

গ্যালিপলির যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত শুরু হয় তুরস্কের গ্যালিপলি উপত্যকায়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ব্রিটিশ, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের মিলিত বাহিনীর প্রায় ১৪টি ডিভিশন সৈন্য এসে জড়ো হয় স্যার আয়ান হ্যামিল্টনের নেতৃত্বে। এদিকে তাদের প্রতিরোধ করতে অটোমান সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে জমায়েত করা হয় ঠিক ১৪ ডিভিশন সৈন্য যার নেতৃত্বের পুরোভাগে লক্ষ করা যায় মোস্তফা কামাল ও অটো লিমান ফন স্যান্ডার্সের মত দক্ষ সেনানায়ককে। ১৯১৫ সালের ১৯ ফ্রেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ১৯১৬ সালের ৯ জানুয়ারিতে শেষ হওয়ার এ দীর্ঘ সংঘাতে মিত্রবাহিনীর ২ লাখ ৫২ হাজার সৈন্য নিহত হয়। অন্যদিকে অটোমান তুর্কিরা জয়ী হলেও জীবন দিতে হয় ২ লাখ ৫৩ হাজার সৈন্যকে। বিশেষ করে ২৭ এপ্রিল তুর্কি সেনানায়ক কামাল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মিলিত বাহিনী তথা আনজাক সৈন্যদের উপকূলের দিকে তাড়িয়ে দিতে সমন্বিত হামলা চালান।

কিংবদন্তী তুর্কি সেনানায়ক মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে রাতভর যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে তুর্কিরা। অন্যদিকে ১৯ মে তে ৪২ হাজার তুর্কি সৈন্য আনজাকের ১০ হাজার অস্ট্রেলীয় ও নিউজিল্যান্ডের বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। টর্পেডো হামলা চালিয়ে পর পর বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে তুর্কিরা যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য দেখায়। তবে ক্রিমিয়ার দখল বুঝে নিতে মিত্রবাহিনী একের পর এক হামলা চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষের অনেক সৈন্য হতাহত হলেও যুদ্ধের ফলাফল অপরিবর্তিত থাকে। এদিকে উপর্যুপরি ব্যর্থতার দায়ভার গিয়ে বর্তায় জেনারেল হ্যামিল্টনের ওপর। তাকে পরিকল্পনার ত্রুটির জন্য দোষারোপ করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে জেনারেল হ্যামিল্টনকে বরখাস্ত করে ব্রিটিশরা সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়।

দার্দানেলিসের লড়াই

গ্যালিপলির পর তুরস্কের দার্দানেলিস প্রণালির দখল নিয়ে শুরু হয় এক মরণপণ লড়াই। ১৯১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯১৬ সালেল ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এ ভয়াবহ সংঘাত অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত তুর্কি বাহিনী জয়লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষেই হতাহত হয় অসংখ্য। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মিত্রবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন স্যাকভাইল কার্ডেন ও জন ডি রোবেক। প্রায় ৩১টি যুদ্ধজাহাজ, ৩টি ব্যাটল ক্রুজার, ২৪টি ক্রুজার, ২৫টি ডেস্ট্রয়ার, ৪টি মনিটর ও ২৫টি সাবমেরিন নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে মিত্রবাহিনী। তবে প্রবল ক্ষমতাধর মিত্রবাহিনী তুর্কিদের কৌশলের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানে। বিশেষ করে সাবমেরিন হামলায় তুর্কিদের একের পর এক সাফল্য মিত্রবাহিনীকে কোণঠাসা করে দেয়।

ভার্দুনের সংঘাত

১৯১৪ সালে যুদ্ধ শুরু হলে জার্মানরা দ্রুত জয়লাভের চেষ্টা করে নানা দিক থেকে ব্যর্থ হতে থাকে। তবে তাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে মিত্রবাহিনীও তেমন সুবিধা করতে পারেনি। বিশ্বযুদ্ধের মূল যুদ্ধ যখন পরিখার যুদ্ধে পরিণত হয়েছে ঠিক তখনি ফ্রান্সের ভার্দুনে সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। ১৯১৬ সালের ২১ ফ্রেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ মাস ধরে চলা এ সংঘাতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় ফরাসি বাহিনী। মার্শাল ফিলিপ পেঁতা ও জেনারেল রবার্ট নিভেলির নেতৃত্বে জার্মানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ফরাসি সৈন্যরা। জেনারেল এরিক ফন ফাকেন হায়েন প্রায় দেড় লাখ জার্মান সৈন্য নিয়ে তাদের বাধা দিতে গিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত লক্ষাধিক জার্মান সেনার প্রাণহানি ঘটে এ সংঘাতে। পাশাপাশি আহত ও নিখোঁজ হয় আরো অনেকে।

নিভেলি অফেন্সিভ

ফরাসি সেনানায়ক জোসেফ জোফরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ফরাসি জেনারেল রবার্ট নেভেলি ঘোষণা করেন মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় জার্মানদের বিধ্বস্ত করা হবে। তাঁর নামানুসারে এ লড়াইকে নিভেলি অফেন্সিভ বলা হয়। ফ্রান্সের পক্ষে তিনিসহ নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল চার্লস মানগিন, জেনারেল ফ্রাঁসোয়া অ্যান্থনি ও জেনারেল মাজেন। ১২ লাখ ৭ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে হামলা চালিয়ে সেখান থেকে ১ লাখ ৮৭ হাজার সৈন্য হারায় ফ্রান্স। অন্যদিকে জার্মান পক্ষে জেনারেল ফন বোহেন ও জেনারেল ফ্রিটজ ফন বুলোর নেতৃত্বাধীন ১০ লক্ষ সৈন্যের বাহিনী থেকে নিহত হয় ১ লাখ ৬৮ হাজার। আইসনি নদী উপত্যকায় চলা এ সংঘাতে জেনারেল নিভেলি শেষ পর্যন্ত তার কথা রাখতে পারেননি। ফলে এ যুদ্ধে জার্মানদের কৌশলগত বিজয়ের কথা ধরে নেয়া যেতেই পারে। ফরাসি যুদ্ধমন্ত্রী হুবার্ট লাইটি, চিফ অব স্টাফ জেনারেল হেনরি ফিলিপ পেঁতা এবং ব্রিটিশ কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ডগলাস হেইগ নিভেলির এ পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন শুরু থেকেই। তাদের আপত্তি সত্ত্বেও ফরাসি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিস্টাইড ব্রায়ান্ড এ পরিকল্পনা অনুমোদন করলে ক্ষোভে পদত্যাগ করেন যুদ্ধমন্ত্রী হুবার্ট লাইটি।

ব্যাটল অব সোম

ফ্রান্সের পিকার্ডির সোম অঞ্চলে ১৯১৬ সালের ১ জুলাই থেকে শুরু হয় এক প্রাণঘাতী সংঘাত যা ১৯১৭ সালের ১৮ জুলাই পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল অমীমাংসিত থাকলেও দু'পক্ষেই প্রচুর হতাহত হয়। ম্যাক্স ফন গ্যালউইজ ও ফ্রিটজ ফন বুলোর নেতৃত্বাধীন জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা। এক্ষেত্রে মিত্রবাহিনীর পক্ষে যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স ও নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের সৈন্যরা জড়ো হয় ডগলাস হেউগ ও ফার্দিন্যান্দ ফচের নেতৃত্বে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ৫০ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে লড়তে থাকা জার্মানদের পক্ষে এ

যুদ্ধে মারা যায় ৪ লাখ ৬৫ হাজার সৈন্য। অন্যদিকে ৫১ ডিভিশন মিত্রবাহিনীর সৈন্য থেকে হতাহত হয় সাড়ে ছয় লাখের মত। মিত্রবাহিনীর অনেকগুলো বিমান ও শক্তিশালী ট্যাংকও ধ্বংস হয় এ যুদ্ধে।

ভিমি রিজের লড়াই

ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ভিমি ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনের অন্যতম সুরক্ষিত স্থান। এটাকে অনেকটা দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে মনে করা হত। ১৯১৭ সালের ৯ থেকে ১২ এপ্রিল এ তিন দিন এখানে চলে ভয়াবহ সংঘর্ষ। জার্মান বাহিনীর পক্ষ থেকেও এখানে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে দেখা যায়। তারা সুড়ঙ্গ, কাঁটাতারের বেড়া, তিন স্তরের পরিখা, প্রচুর কামানের প্রহরার পাশাপাশি অগণিত মেশিনগান পয়েন্ট স্থাপন করে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করেছিল। এর আগে পাহাড়টির দখল নিতে গিয়ে ব্রিটিশরা হাজার হাজার সৈন্য খুইয়েছিল। ১৯১৫ সালের লড়াইয়ে সেখানে ফরাসি সৈন্যরাই মারা যায় দেড় লাখের মত। এবার কানাডা ও যুক্তরাজ্যের বাহিনী সম্মিলিতভাবে জেনারেল জুলিয়ান বায়ানগ ও জেনারেল আর্থার কুরির নেতৃত্বে আক্রমণ চলায়। তাদের ৩০ হাজার সৈন্য থেকে ৩৫৮৯ জন নিহত হলেও যুদ্ধের ফলাফল তাদের পক্ষেই যায়। জার্মানি প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের ২০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। এক্ষেত্রে কানাডার ৯টি প্রদেশের প্রত্যেকটি স্থান থেকে সৈন্যরা দিয়ে ভিমি রিজের দখলযুদ্ধে অংশ নেয়।

জুটল্যান্ড রণাঙ্গন

উত্তর সাগরের জুটল্যান্ড রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর মুখোমুখি হয় ব্রিটিশ-আইরিশ যৌথ বাহিনীর একটি দল। ১৯১৬ সালের ৩১ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত চলতে থাকা এ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কৌশলগত বিজয় লক্ষ করা যায় জার্মান বাহিনীর। স্যার জন জোলিকোয়ি ও স্যার ডেভিড বিটির নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী নিয়ে সমবেত হয় ইঙ্গো-আইরিশ সেনারা। তাদের সাথে ২৮টি যুদ্ধজাহাজ, ৮ টি ব্যাটল ক্রুজার, ৮টি সাঁজোয়া ক্রুজার, ২৬টি হালকা ক্রুজার ও ৭৮টি ডেস্ট্রয়ার ছিল। এদিকে ১৬টি যুদ্ধজাহাজ, ৫টি ব্যাটল ক্রুজার ড্রিডনট, ১১টি হালকা ক্রুজার ও ৬১টির মত টর্পোডো বোট নিয়ে রেইনহার্ড শীয়ার ও ফ্রাঞ্চ ফন হিপারের নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে জার্মানরা। তবে এবারের যুদ্ধে জার্মান ইউবোটকে অকার্যকর রাখাটাই ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর বড় কৃতিত্ব।

ককেশাসের যুদ্ধ

একেবারে শুরু থেকে শেষ অর্থাৎ ১৯১৪ সাল হতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ককেশাসের দখল নিয়ে লড়াই চলতে থাকে রুশ ও অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে। পূর্বাঞ্চলীয় আনাতোলিয়ার এ স্থান কৌশলগতভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় রুশ ও তুর্কি বাহিনীর কেউই ছাড় দিতে চায়নি। ফলে তুরস্কের জেনারেল আনোয়ার পাশা, জেনারেল করিম পাশা, জেনারেল মোস্তফা কামাল ও জেনারেল কাজিম কারাবাকির নেতৃত্বে অটোমান বাহিনী তুমুল লড়াই জমিয়ে রাখে শেষ পর্যন্ত। এদিকে বেশ কয়েকজন সেনানায়ক যেমন জেনারেল আইভানোভিচ ভরন্তসভ দাসখব, জেনারেল নিকোলাই ইউদেনিস, জেনারেল আন্দ্রানিক ওজানিয়ান, জেনারেল দ্রাস্তামাত কানায়ান, জেনারেল নাজদেহ, জেনারেল মোভসেজ সিলিকায়েন, ক্রেস ফন কেসেনস্টোইন, জেনারেল লিওনেল দুনস্তারভিল প্রমুখের নেতৃত্বে রুশ সাম্রাজ্য আর্মেনিয়ার লড়াই চলতে থাকে। দীর্ঘ যুদ্ধে দু'পক্ষের প্রচুর হতাহত হলেও কোনো পক্ষই বড় বিজয় অর্জন করতে পারেনি।

সিনাই-ফিলিস্তিনের পথে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনের মত মধ্যপ্রাচ্য রণাঙ্গনেও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ১৯১৫ সালের ২৮ জানুয়ারি থেকে ১৯১৮ সালের ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত সিনাই উপদ্বীপ, ফিলিস্তিন ও সিরিয়াতে তুমুল লড়াই চলে। যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী জয়লাভ করলেও অটোমান তুর্কিদের পাশাপাশি জার্মান বাহিনী ছেড়ে কথা বলেনি। স্যার জন ম্যাক্সওয়েল, আর্চিবল্ড মুরে, হেনরি, জর্জ চাউভেল, ফিলিপ চেটউট, চার্লস ডোবেল ও এডমন্ড অ্যালেনবাইয়ের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বাহিনী আক্রমণ করে সিনাই উপত্যকা। তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন জামাল পাশা, ক্রেস ফন ক্রেসেনস্টেইন, জাদির বে, তালা বে, এরিক ফন ফাকেনহায়েন ও অটো লিমান ফন স্যান্ডার্সের নেতৃত্বাধীন তুরস্ক ও জার্মানির মিলিত বাহিনী। তুর্কি নৌমন্ত্রী জামাল পাশার নেতৃত্বে অটোমান বাহিনী সুয়েজ খালের প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। পানি ও রাস্তাঘাটবিহীন সিনাইয়ের ফাঁকা উপত্যকা পাড়ি দেয়া যেকোনো সেনাবাহিনীর জন্য এককথায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু ক্রেস ফন ক্রেসেনস্টেইন এই মরুভূমি পাড়ি দিয়ে তুর্কি বাহিনীর কাছে রসদ পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত মিসরে নিযুক্ত ব্রিটিশ

বাহিনীকে অটোমান তুর্কিদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন অভিযানে নির্দেশ দেয়া হয়। এদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানদের স্প্রিং অফেন্সিভ শুরু হলে সিরিয়ায় হামলার পরিকল্পনা কয়েক মাস পিছিয়ে দেয় মিত্রবাহিনী।

কুত অবরোধ

মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে অটোমান তুর্কিদের বিজয় অভিযান হিসেবে কুত অবরোধের কথা বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ ভারতের সৈন্যসহ ব্রিটেনের সেনাবাহিনীর ৩০ হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল টাউনশেন্ড যার ২৩ হাজার এ যুদ্ধে হতাহত হয়। অন্যদিকে তুর্কি বাহিনীর ৫০ হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন ব্যারন ফন ডার গোলটাজ ও খলিল পাশা। শেষ পর্যন্ত তুর্কি বাহিনীর ১০ হাজার সৈন্য নিহত হলেও কুল আল-আমারা মেসোপটেমিয়া তথা বর্তমান ইরাকের কাছাকাছি সংঘটিত এ লড়াইয়ে জয়লাভ করে অটোমান তুর্কিরাই। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জেমস মরিস কুতের যুদ্ধে পরাজয়কে তাদের ইতিহাসে একটি ন্যক্কারজনক আত্মসমর্পণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ম্যাগিদোর সংঘাত

১৯১৭ সালের শেষদিকে জেরুজালেম দখল করেও স্বস্তি মেলেনি মিত্রবাহিনীর নেতা জেনারেল এডমান্ড অ্যালেনবাইয়ের। ঠিক এসময়ে জার্মানরা স্প্রিং অফেন্সিভ শুরু করে পশ্চিম রণাঙ্গনে আতঙ্কের জন্ম দেয়। সেখানে মিত্রবাহিনী নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। জেরুজালেম থেকে কয়েক ইউনিট সৈন্য সরিয়ে সেখানে শক্তিবৃদ্ধি করা হলে এদিকে দুর্বলতা দেখা দেয়। এদিকে তার ট্যাংক বাহিনীকেও পাঠিয়ে দেয়া হয় ফ্রান্সের রণাঙ্গনে। বলতে গেলে নানা দিক থেকে কোণঠাসা অবস্থায় পড়েও অ্যালেনবাই জর্দার নদীর দখল নিতে মরিয়া হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ম্যাগিদোতে ১৯১৮ সালের ১৯ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ঘটে তুমুল সংঘাত। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও আরব বিদ্রোহীদের সে বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল এডমান্ড অ্যালেনবাই। ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৫৭ হাজার পদাতিক সৈন্যের পাশাপাশি ৫৪০টি কামান নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে তারা। শেষ পর্যন্ত তুর্কি বাহিনী তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

জেরুজালেমের যুদ্ধ

মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি এ তিন ধর্মের কাছে পবিত্র ঐতিহ্যবাহী নগরী জেরুজালেমের দখল নিয়ে ১৯১৭ সালের ৮-২৬ ডিসেম্বর তুমুল যুদ্ধ চলে। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মিশরীয় এক্সপিডিশনারি ফোর্সের সৈন্যরা জেনারেল এডমন্ড অ্যালেনবাইয়ের নেতৃত্বে আক্রমণ করে ফিলিস্তিনের জেরুজালেম অঞ্চল। তাদের প্রতিরোধে জেনারেল এরিক ফন ফাকেন হায়েনের সপ্তম আর্মি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশদের পক্ষে ১৮ হাজার হতাহতের বিপরীতে তুর্কি সৈন্যদের মধ্যে ২৫ হাজার সৈন্য নিহত হয়। তবে অবাক করার বিষয় হচ্ছে উভয় পক্ষ প্রথমে পবিত্র এ নগরীর মর্যাদা রক্ষার শপথ নিলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা শপথ ভঙ্গ করে জয়লাভের জন্য নগরীর আশে পাশেও লড়াই চালিয়ে যায়।

স্প্রিং অফেন্সিভ

মর্কিন বাহিনী এসে পৌঁছে গেলে তাদের বিশাল বহরের সামনে জার্মানদের টিকে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই জেনেই লড়াইয়ের শেষ চেষ্টা হিসেবে চালানো হয় স্প্রিং অফেন্সিভ। জেনারেল লুডেনডর্ফের বাহিনী ১৯১৮ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে এক ব্যাপক অভিযান শুরু করে। ২১ মার্চ ব্রিটিশ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে জার্মানরা ৬০ কিলোমিটার এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বলতে গেলে ১৯১৪ সালের পর এটাই তাদের প্রথম সাফল্য। এক্ষেত্রে পদাতিক বাহিনী হুঁশিয়ার কৌশলে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা শত্রুর এগিয়ে আসা বাহিনীগুলোকে ছত্রখান করে দিতে স্টর্মস্ট্রুপার গঠন করে। অন্যদিকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল গিওর্গ ব্রুচমুলার ফিউয়ারভালজি কৌশলে গোলন্দাজ বাহিনীকে পরিচালনা করেন। তাদের কার্যকর ও পরিমিত গোলাবর্ষণে শত্রু কমান্ড ধ্বংস হয়। পাশাপাশি এর মাধ্যমে খুব সহজে শত্রুর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলোর গতিরোধ করে তাদের কমান্ড ও লজিস্টিক এরিয়াগুলোর দখল নেয়া সম্ভব হয়। এভাবে জার্মান বাহিনী প্যারিসের ১২০ কিলোমিটার ভিতরে চলে গিয়ে তিনটি ভারী সুপার ক্রুপ রেলওয়ে গান থেকে এক প্যারিসেই ১৮৩ টি গোলা নিক্ষেপ করে। লোকজন প্যারিস থেকে পালাতে শুরু করে উচ্ছ্বসিত কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম ২৪ মার্চ জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেন। তবে মিত্রবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধ জার্মানদের সব চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ করে দেয়। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য এনে পশ্চিম রণাঙ্গনে নিজেদের অবস্থান আরো শক্তিশালী করে। অন্যদিকে ট্যাংক ও মোটরচালিত আর্টিলারি ফোর্সের ঘাটতি জার্মানদের অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে দেয়নি।

মিত্রবাহিনীর জয়লাভ

জার্মানির দুর্নিবার আক্রমণে অপারেশন মিচেল, জর্জেটি এবং ব্লুচার ইয়র্ক শিরোনামে শেষ হয় স্প্রিং অফেন্সিভ। প্রথম দিকে আশাতীত সাফল্য পেলেও শেষ পর্যন্ত তারা সাফল্য ধরে রাখতে পারেনি। তারপর ১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎ আসতে না আসতেই মিত্রবাহিনী নানা স্থানে জার্মানদের ওপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে শুরু করে। বিশেষ করে মার্কিন সৈন্যরা রণাঙ্গনে পা রাখতেই যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন শুরু করে। নানা স্থানে এগিয়ে থাকা জার্মান সৈন্যরাও এবার ধীরে ধীরে পিছু হটতে থাকে। এতদিন মিত্রবাহিনী সহযোগী হিসেবে থাকা মার্কিনরা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে পা রেখে ফলাফল ভিন্নদিকে ঘুরিয়ে দেয়। ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন সরাসরি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একইভাবে জার্মানির সাথে বন্ধুত্ব ধরে রাখায় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে।

জার্মানি মনে করেছিল তাদের ইউবোট মার্কিন বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করে দেবে। অন্যদিকে স্প্রিং অফেন্সিভের মাধ্যমে তারা দ্রুত জয়লাভের যে স্বপ্ন দেখেছিল সেটাও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসতে শুরু করে। আর এমনি পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী সরাসরি মিত্রবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে ১৯১৮ সালের ৮ আগস্ট হান্ড্রেড ডেজ অফেন্সিভ শিরোনামে শুরু করে পাল্টা অভিযান। মার্শাল ফচের সুদক্ষ অভিযান জার্মানির গড়ে তোলা হিন্দেনবার্গ লাইনকে ছত্রখান করে দেয়। জার্মান ইউবোটগুলোকে আগেই প্রতিরোধ করেছিল বিশেষ মার্কিন নৌ ব্যবস্থা। মিত্রবাহিনী সার্বিয়া দখল করে নিলে ৩০ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়া শান্তিচুক্তিতে সই করে। এর একদিন পরেই ৩১ অক্টোবর যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য হন তুর্কি সুলতান। একইভাবে ইতালির যুদ্ধ পরাজিত হয়ে ৩ নভেম্বরেই শান্তিচুক্তিতে সম্মত হয়েছিল অস্ট্রিয়া। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের পাশাপাশি মিত্রবাহিনীর সুগঠিত আক্রমণ দেখে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম হল্যান্ডে পালিয়ে যান। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মিত্রবাহিনীর চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হয়।

অস্ত্র সমর্পণ

প্রচুর আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ৩৫ লাখ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করা জার্মানির সৈন্যসংখ্যা ২৫ লাখে এসে দাঁড়ায়। ১০ লক্ষাধিক সৈন্য হারিয়ে অনেক দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে জার্মানরা। এসময় মিত্রবাহিনীর সাথে সাথে তাদের সহযোগী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা সরাসরি মাঠে নামলে পরিস্থিতি জার্মানির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । রণাঙ্গনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জার্মান সৈন্যরা প্রতিপক্ষের বহুমুখী আক্রমণ ও কূট কৌশলের পাশাপাশি একটি বৈশ্বিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একা একা লড়াই করে শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেনি। জনমত থেকে শুরু করে সবকিছু তাদের বিরুদ্ধে চলে গেলে ১৯১৮ সালের ৩ অক্টোবর যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয় জার্মানি। তবে পুরোটা সময় বীরত্বের সাথে লড়াই করে শেষ পর্যায়ে এসে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে রাজি না হয়ে বরং ২৬ অক্টোবর পদত্যাগ করেন জেনারেল লুডেনডর্ফ। এদিকে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম দেশ ছেড়ে হল্যান্ড পালিয়ে গেলে সিংহাসনে বসেন প্রিন্স ম্যাক্স। এ অবস্থায় ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর কম্পেইনের বনাঞ্চলে একটি রেলওয়ের বগিতে স্বাক্ষরিত হয় জার্মান-মিত্রবাহিনী অস্ত্রবিরতি চুক্তি। বলতে গেলে এর মধ্যে দিয়েই অবসান হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের।

পাঠ- ৩.৫ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানা ছাড়িয়ে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এসে আছড়ে পড়েছিল উত্তাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও হত্যাযজ্ঞের ঢেউ। ১৯১৪-১৯১৮ মাত্র চারটি বছরের যুদ্ধ, কেড়ে নেয় প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষের প্রাণ। নেভাল অপারেশন ইন দার্দানেলিস, ব্যাটেল অব ভার্দুন, নিভেলি অফেন্সিব, ব্যাটল অব সোমে, ব্যাটল অব ভিমি রিজ, ব্যাটল অব জুটল্যান্ড, ব্যাটল অব ককেশাস, আর্মেনিয়ার হত্যাকাণ্ড, ফিলিস্তিন ও সিনাই উপত্যকা অভিযান, কুত অবরোধ, জেরুজালেম ও ম্যাগিদোর যুদ্ধ শেষে মিত্রবাহিনীর বিজয় সম্ভব হয়। জার্মানিকে বাধ্যতামূলক অস্ত্রবিরতিতে পাঠানোর পর বসে প্যারিস শান্তি সম্মেলন। এরপর ট্রায়ানন, সেভার্স, লাউসেন, কিংবা অপমানজনক ভার্সাই চুক্তির মধ্য দিয়ে অনেক পেছন থেকে 'ছুরিকাঘাত' করা হয় জার্মানিকে। যুদ্ধের প্রধান কিছু ফলাফল হিসেবে বলা যেতে পারে–

১. **সীমাহীন প্রাণহানি :** বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে হওয়া যুদ্ধে নিহত সৈন্যসংখ্যা ছিল ৯০ লাখের কাছাকাছি। তেমনি একে বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছিল ৭০ লাখের উপর। তবে এখানে সামরিক বলতে যেসব মানুষের হিসেব দেয়া হয়েছে তাদের অনেকেই ছিল বেসামরিক মানুষ। যুদ্ধ শুরু হলে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের ঠেলে দেয়া হয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। বিশেষ করে পশ্চিম রণাঙ্গনে লড়তে গিয়ে এমনিভাবে জীবন দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এ যুদ্ধে রাশিয়ার ৩৭,০০,০০০; জার্মানি ২৫,৩৩,৭০০; অটোমান সাম্রাজ্য ২৪,৭৫,০০০; অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ১৫,০০,০০০; ফ্রান্স ১৪,১৫,৮০০; ব্রিটেন ৭,৩৩,৬৩৩; রুমানিয়া ৬,১০,৭০৬; ইতালি ৬,৫০,০০০; এবং যুক্তরাষ্ট্রের ১,২৬,০০০ সৈন্য হতাহত হয় বলে অনুমান করা যায়।

২. **মনোদৈহিক প্রতিবন্ধকতা :** বিশ্বযুদ্ধের ফলে লক্ষ লক্ষ যুবকের প্রাণহানির পাশাপাশি আহত হয়েছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। এ আহত জনগোষ্ঠী তাদের উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। বিশেষ করে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে যতটা সুস্থ জনগোষ্ঠী থাকা প্রয়োজন ইউরোপের বেশিরভাগ দেশের সে সক্ষমতা ছিল না। কারণ বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদান ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাদের হয়ত নিহত নয়ত আহত করেছিল। শেষ পর্যন্ত এ অবস্থান রাষ্ট্রগুলোর জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনে।

৩. **রাজতন্ত্রের পতন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। উদাহরণ হিসেবে রাশিয়ার রোমানভ বংশীয় জার, জার্মানির হোহেনজোলার্ন বংশীয় কাইজার, তুরস্কের উসমানীয় খিলাফত এবং অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের পতন ঘটে। রাশিয়ার শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করেন। জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে নতুন করে গড়ে উঠতে দেখা যায় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো।

৪. **উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বিশ্বের নানা দেশে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মানুষকে এতোদিন বিশ্বযুদ্ধের ভয় দেখিয়ে চুপ রাখা গিয়েছিল। এবার বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতেই তারা ইউরোপের নানা দেশের ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোয় আন্দোলন শুরু করে। এভাবে অনেকগুলো উপনিবেশ স্বাধীনও হয়ে গেছে।

৫. **জাতীয় রাষ্ট্র গঠন :** পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে রাষ্ট্রচিন্তার যে বিকাশ ঘটেছিল এটা তার বিস্তৃত রূপ। প্রথম দিকের রাষ্ট্র ছিল ধারনাগত, আর এবারের রাষ্ট্র একটি বাহ্যিক কাঠামো লাভ করে। তবে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্ব হিসেবে পিছিয়ে যেতে হয় আরো কয়েকশ বছর। এক্ষেত্রে জাতীয় রাষ্ট্র বিকাশের চূড়ান্ত স্তর হিসেব গণ্য করা যেতে পারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালকে।

৬. **ব্রিটিশ-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল তারই ফলাফল হিসেবে শুরু হয় ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এরপর থেকে দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে স্বাধীন করে উপমহাদেশকে।

৭. **সামাজিক পরিবর্তন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রাজনৈতিক কাঠামোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এসময় রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

৮. **জাতিপুঞ্জের উদ্ভব :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অগণিত মানুষের প্রাণহানি অনেককে বিচলিত করে। এসময় যুদ্ধের ভয়াবহতা এড়াতে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন পেশ করেছিলেন ১৪ দফা ঘোষণা। এর ওপর ভিত্তি করে পরে গড়ে ওঠে লীগ অব নেশন তথা জাতিপুঞ্জ।

৯. **একনায়কতন্ত্রের উত্থান :** অপমানজনক ভার্সাই চুক্তি মেনে নেয়া কোনো বোধশক্তিসম্পন্ন জার্মান নাগরিকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বলতে গেলে এ চুক্তিই পরবর্তীকালে একনায়কনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিশ্বকে আরেকটি মহাযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

১০. **জার্মানির অবরোধ :** যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিগুলো নানাদিক থেকে জার্মানির ওপর অবরোধ আরোপ করে তাকে কোণঠাসা করে রাখতে চাইছিল। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই মিত্রবাহিনীর দেশগুলো এ চেষ্টায় লিপ্ত হয়।

১১. **প্রতিশোধ গ্রহণ :** ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স জার্মানির সাথে বহু বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে এমন অনেকগুলো চুক্তি জার্মানির ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় যা অনেকটাই বিদ্বেষমূলক ও অনৈতিক।

১২. **মহামারী :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে গ্যাসবোমা হামলা করে মিত্রবাহিনীর পাশাপাশি জার্মানরাও। বিষাক্ত গ্যাস নানা স্থানে ছড়িয়ে পরে সৃষ্টি করে নানা রোগের উপসর্গ। অনেক এলাকায় এসময় ক্লোরিনের বিষক্রিয়া নানা রোগের পাশাপাশি মহামারী আকারে ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

১৩. **খাদ্যসংকট :** যুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন স্থানে পরিখা খনন থেকে শুরু করে সৈন্য বাহিনী এগিয়ে নিতে গিয়ে বিনষ্ট করা হয় মাইলের পর মাইল শস্যক্ষেত। অন্যদিকে নানা স্থানের কৃষক কৃষিকাজ বাদ দিয়ে বাধ্যতামূলক যুদ্ধে যোগদান করে। তাদের বাদ পড়ায় কৃষি উৎপাদন অনেকাংশে কমে যায়। এর প্রভাবে যুদ্ধশেষে চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয় বিশ্বের নানা দেশে।

পাঠ- ৩.৬ ভার্সাই সন্ধিচুক্তি

প্যারিসের অদূরে অবস্থিত ভার্সাই নগরীতে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন জার্মানির ওপর কিছু অনৈতিক শর্ত চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে শেষ হয় ভার্সাই চুক্তি। ফ্রান্সের কম্পেইনের বনাঞ্চলে ট্রেনের বগিতে বসে করা অস্ত্রবিরতি চুক্তির পরবর্তী ধাপ হিসেবে করা হয় এই চুক্তি। এর মাধ্যমে মিত্রবাহিনীর সাথে দীর্ঘ চার বছর ভয়াবহ যুদ্ধের কড়ায় গণ্ডায় জার্মানির কাছ থেকে উসুল করা হয়। অনেকগুলো ধারার এ চুক্তিতে উল্লিখিত ২৩১-২৪৭ ধারার আওতায় জার্মানিকে যুদ্ধ শুরু থেকে আনুষঙ্গিক সব দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। তারা ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তাদের বিশাল ভূখণ্ড থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ মিত্রবাহিনীর অনুকূলে ছেড়ে দেয়। বিশেষ করে পশ্চিম রণাঙ্গনে নিজেদের ক্ষতি মিটিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন ফরাসি মন্ত্রী ক্লিমেনশঁ। তাঁর দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে ভার্সাই চুক্তির শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয় অনেকগুলো অবাস্তব ধারা। যার মধ্যে ছিল–

১. জার্মানির সব ধরনের সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা।
২. ফরাসি সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্য পুরোপুরি স্বীকার করে নেয়া।
৩. জার্মান নিয়ন্ত্রিত টনডার্ন শহরের পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলীয় স্লেসউইগ ডেনমার্কের অধীনে ছেড়ে দেয়া।
৪. পোজেন ও পশ্চিম প্রুশিয়ার পোমেরানিয়া নবগঠিত পোল্যান্ডের কাছে ছেড়ে দিতে হবে।
৫. উচ্চ সাইলেশিয়ার হাল্টশিন হালসিজিন এলাকা চেকশ্লোভাকিয়ার কাছে হস্তান্তর।
৬. গণভোট সাপেক্ষে সাইলেশিয়ার পূর্বাংশকেও পোলান্ডের অনুকূলে ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকা।
৭. ইউপেন ও মালমেডির মত সমৃদ্ধ জার্মান শহরকে বেলজিয়ামের কাছে হস্তান্তর করা।
৮. পূর্ব প্রুশিয়ার সোলডাউ এলাকা পোল্যান্ডকে ছেড়ে দেয়া।
৯. পূর্ব প্রুশিয়ার মামেলল্যান্ডকে লিথুয়ানিয়ার আনুকূল্যে ত্যাগ করা।
১০. ওয়ার্মিয়াও মাসুরিয়ার নিয়ন্ত্রণ পোল্যান্ডকে ফিরিয়ে দেয়া।
১১. ডানজিগ বন্দরকে উন্মুক্ত নগরী ঘোষণা করা যা জাতিপুঞ্জের অধীনে থাকবে।
১২. চীনের শানদং (Shandong) থেকে জার্মানির নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেয়া।

ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা ক্ষোভ প্রশমনে জার্মানিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। পাশাপাশি রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, ঔপনিবেশিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, প্রতিটি ক্ষেত্রে এ চুক্তি জার্মানিকে হেয়প্রতিপন্ন করে। বিশেষ করে সম্পূর্ণভাবে চাপিয়ে দেয়া এ চুক্তির কিছু শর্ত এমন ছিল যা জার্মানির মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে প্রণোদিত করেছিল। সন্ধি বলতে দু'পক্ষে মতামতের যে প্রতিফলন ঘটার কথা তার বিন্দু-বিসর্গও এখানে উপস্থিত ছিল না। উপরন্তু মিত্র শক্তির নানা দেশ থেকে জার্মানির ওপর তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার একটি প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। চুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে–

১. **রাজনৈতিক হেয়করন :** ভার্সাই চুক্তি রাজনৈতিক দিক থেকে জার্মানিকে ছত্রখান করে দেয়। এ চুক্তির পর নতুন করে তৈরি খণ্ড-বিখণ্ড মানচিত্রে একত্রীভূত জার্মানির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দায়। তাদের পশ্চিম সীমান্তে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা প্রাচীন নির্মাণে দখল করা হয়েছে বেশ খানিকটা ভূখণ্ড। উত্তর সীমান্ত থেকে অনেকটাই চলে গেছে ড্যানিশদের দখলে। পূর্ব সীমান্তের ভেতরে ঢুকে পড়েছে নবগঠিত পোল্যান্ড। ইউপেন, মরিসনেট ও ম্যালমেডি অঞ্চলের ওপর জার্মানির বদলে বেলজিয়ামের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। চুক্তির প্রথম দিকের শর্ত অনুযায়িই আলসেস ও লোরেনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে ফরাসিরা। সবমিলিয়ে রাতারাতি বদলে দেয়া হয় ইউরোপের মানচিত্র।

২. **সামরিক অপদস্তকরণ :** পরাজিত জার্মানির সামরিক শক্তিকেও মিত্রবাহিনী কতটা ভয় করত ভার্সাই চুক্তির শর্ত থেকে তা বোঝা যায়। এ চুক্তির আওতায় জার্মানির স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মান বাহিনীর উচ্চপদস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ সেনা কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়। ভবিষ্যতে জার্মানির ভূখণ্ডে সব ধরনের অস্ত্র কারখানা নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। জার্মানির সবগুলো উন্নত যুদ্ধজাহাজকে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিতে হয়।

৩. **বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ :** রাজনৈতিকভাবে জার্মানিকে হেয় প্রতিপন্ন করার সাথে সাথে মিত্রবাহিনী তাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য খাতে ধ্বস নামাতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত জোরপূর্বক তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতির ব্যয়ভার বহন করতে জার্মানিকে বাধ্য করা হয়। বিশেষ কমিশন গঠন করে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পাশাপাশি জার্মানির রাইন নদীপথকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জার্মানির বাজার উন্মুক্ত করে সেখানে মিত্রবাহিনীর দেশগুলোর পণ্যের অবাধ বিক্রি নিশ্চিত করা হয়। মিত্রবাহিনীর দেশগুলো জার্মানি থেকে জ্বালানি রপ্তানি শুরু করে। পরিকল্পিতভাবে জার্মানির সব ধরনের শিল্প ধ্বংস করা হয়। সেখানে উৎপাদিত কাঁচামাল দিয়ে সেখানে কারখানা প্রতিষ্ঠা না করে অন্য দেশে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে জার্মানির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়ার ষড়যন্ত্র বাস্তবে রূপ দেয় মিত্রবাহিনী যা অনেক আগে থেকে পরিকল্পিত ছিল।

৪. **মিত্রবাহিনীর অধীনে জার্মানির উপনিবেশ :** ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মত বিশ্বের নানা এলাকায় জার্মানিরও উপনিবেশ ছিল। এবারে চুক্তি করে মিত্রবাহিনীর দেশগুলো সেসব উপনিবেশ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বটোয়ারা করে নেয়া। পাশাপাশি তারা নিয়ম বেঁধে দেয় এরপর আফ্রিকা, এশিয়া কিংবা আমেরিকার কোনো স্থানে জার্মান উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ নেই।

৫. **যাতায়াত ও পরিবহন :** জার্মানির রেল ইঞ্জিন থেকে শুরু করে উন্নত ধরনের সব যানবাহনের ওপর ভাগ বসায় মিত্রবাহিনী। তারা শক্তিশালী ট্রাকের ইঞ্জিনগুলো পর্যন্ত জার্মান থেকে নিয়ে যায় নিজেদের দেশে। বিভিন্ন স্থানে নতুন করে রাস্তা নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। অনেকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতু মেরামতের ওপর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এক্ষেত্রে।

৬. **বিচার আচার :** মিত্রবাহিনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য পুরোপুরি দায়ী করে জার্মানিকে। এজন্য তারা জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ও তার সেনাপতিদের দোষী সাব্যস্ত করে বিচারের দাবি জানায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধরত শক্তিমান জেনারেলদের নামও বেশ ক্ষোভের সাথে উচ্চারণ করা হয়।

৭. **জাতিপুঞ্জ :** বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ঘোষণার অনুরূপ শর্তসাপেক্ষে একটি জাতিপুঞ্জ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধবাজ নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কথা জানানো হলেও মূলত জার্মানিতে আরো বড় রকমের চাপে রাখার কৌশল ছিল এটি।

৮. **আন্তর্জাতিক আদালত :** ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এ আদালতের মাধ্যমে গণহত্যার মত অপরাধের বিচার হওয়ার কথা দাবি করে মিত্রবাহিনীর বিভিন্ন দেশ। বলতে গেলে সবদিক থেকে জার্মানিকে চেপে ধরার অন্যতম চেষ্টা এটিও।

৯. **ঐতিহাসিক প্রতিশোধ :** ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মিরর হলে। এখানেই পরাজিত জার্মানদের ওপর জোরপূর্বক চুক্তির শর্ত চাপিয়ে দিয়ে ১৮৭০ সালের প্রতিশোধ নেয় ফরাসিরা। এই হলেই জার্মান নেতা বিসমার্ক বন্দি ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেছিলেন। অন্যদিকে হিংস্রতার সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জার্মানির জনগণ বলছে তারা সই করবে না, তাদের পত্রিকাগুলোও বলছে সই না করতে, তাদের রাজনীতিবিদদের কণ্ঠেও একই সুর। তবে আমরা বলছি যদি ভদ্রলোকের সন্তান হয়ে থাকেন আসুন এবং সই করে যান, নাহলে আপনাদের ঘাড় ধরে সই করিয়ে নিতে আমাদেরই বার্লিন আসতে হবে।'

১০. **প্রতিবাদের শুরু :** জার্মান জাতীয়তাবাদী লেখকগণ শুরু থেকেই ভার্সাই চুক্তিকে ঘৃণ্য, বর্বর ও জবরদস্তিমূলক অনাচার হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে ভুল করেননি। এ চুক্তিই হয়ত ভবিষ্যতে ক্ষুব্ধ জার্মানিকে তাদের অপমানের প্রতিশোধ নিতে প্রণোদিত করে আরেকটি যুদ্ধে জড়াতে।

পাঠ- ৩.৭ লিগ অব নেশনস ও তার ব্যর্থতা

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে (১৯১৮-১৯৩৯) প্রতিষ্ঠা পায় জাতিপুঞ্জ তথা লীগ অব নেশনস। আজকের জাতিসংঘ যেমন বিশ্বের কোনো একটি স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্লজ্জভাবে ব্যর্থ তখনকার দিনে গড়ে ওঠা জাতিপুঞ্জও তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহারণ থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে পারেনি। কার্যক্ষেত্রে এর কোনো গুরুত্ব থাক আর নাই থাক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে এর গুরুত্ব উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। বলতে গেলে এর প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্যদের সিংহভাগ ইউরোপীয় হওয়ায় অন্য দেশের সেখানে সহজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত ইউরোপেরই বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে ভেঙে যায় লীগ অব নেশনস। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব অনেক বড় হয়ে উঠতে দেখা গেলে শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় এই জাতিপুঞ্জ তথা লীগ অব নেশনস। লীগ অব নেশনসের ব্যর্থতার কারণগুলো হচ্ছে–

১. **ভার্সাই চুক্তি :** ফ্রান্সের জাতিগত জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য জার্মানির ওপর অনেকগুলো শর্ত আরোপ করে সম্পাদিত হয় ভার্সাই চুক্তি। অসম ও অনৈতিক এই চুক্তি লীগ অব নেশনস তথা জাতিপুঞ্জের ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ।

২. **অলীক আন্তর্জাতিকতা :** একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও সেখানে চারটি বৃহৎ রাষ্ট্রের বাইরে অন্যদের কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না বললেই চলে। বলতে গেলে এই অবস্থানগত অসঙ্গতিও লীগ অব নেশনসের ভেঙে পড়ার মূল কারণ।

৩. **দ্বিমুখী নীতি :** বিশ্বের নানা স্থানে নিষ্পেষণকারী ঔপনিবেশিক দেশগুলো যখন শান্তির কথা প্রচার করেছিল তা শুরু থেকেই গণমানুষের আস্থা হারায়। তাই প্রথম দিক থেকেই রাষ্ট্রনেতাদের অংশগ্রহণে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সংগঠন যতটুকু টিকে ছিল তাও ভেঙে পড়ে।

৪. **সহযোগিতার অভাব :** নামমাত্র লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠা পেলেও মিত্র শক্তির বিজয়ী দেশগুলোর মধ্যে একধরনের থমথমে পরিবেশ বিরাজ করে। তারা নামমাত্র একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকার কথা বললেও সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তির ঘাটতি ছিল চোখে পড়ার মত।

৫. **আঞ্চলিকতা ও অখণ্ডতা :** লীগ অব নেশনস বিভিন্ন জাতির অখণ্ডতা বজায় রাখতে কাজ করার কথা। কিন্তু ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে যেভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয় লীগ অব নেশনস সেক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকে নিজের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৬. **রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা :** জাতিপুঞ্জ বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিয়ে কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু জার্মানির ওপর অবৈধ অবরোধকে নির্লজ্জের মত সমর্থন দিয়ে গেছে এ প্রতিষ্ঠানটিই। এক্ষেত্রের ব্যর্থতাও লীগ অব নেশনস এর পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

৭. **চীন জাপান দ্বন্দ্ব :** চীন ও জাপানের দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা দ্বন্দ্ব নিরসনেও পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এই সংগঠনটি। ফলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিরোধিতা করতে থাকা দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে চীন ও জাপান যে দীর্ঘ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল তা থেকে মুক্ত করতে পারেনি এই লীগ অব নেশনস তথা জাতিপুঞ্জ। তাই শেষ পর্যন্ত এর ভেঙে পড়াটা হয়ে যায় সময়ের ব্যাপার।

৮. **ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের শক্তিমত্তা :** ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের অহেতুক শক্তিবৃদ্ধি বিশ্বের অন্য দেশের শান্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে তারা ক্রমবর্ধমান শক্তি কাজে লাগিয়ে বিশ্বের নানা স্থানে তাদের উপনিবেশ বিস্তৃতির চেষ্টা চালালে সেখানে নীরব ভূমিকা পালন করে লীগ অব নেশনস। এতে সংস্থাটির ওপর থেকে আস্থা উঠে যায় অন্য দেশগুলোর।

৯. **হিটলারের ও মুসোলিনির আত্মপ্রকাশ :** একনায়ক হিসেবে জার্মানির নেতা অ্যাডলফ হিটলার ও ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনির আত্মপ্রকাশ লীগ অব নেশনসকে শুরুতেই অগ্রাহ্য করে। বিশেষ করে হিটলার ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলো এক এক করে বদলের শপথ নিয়ে অনেকটা বন্ধ করে দেন জাতিপুঞ্জের কার্যক্রমকে।

১০. **মহামন্দা :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরোক্ষ কারণ হিসেবে মহামন্দা দেখা দেয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে তেমন কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করতে না পারায় সংস্থা হিসেবে উপযোগিতা হারায় এ জাতিপুঞ্জ। বলতে গেলে সবাই তখন থেকেই একে ফ্রান্স-ব্রিটিশ অনুগত ও আজ্ঞাবহ একটি অকর্মণ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করে।

১১. **ইউরোপকেন্দ্রিকতা :** জাতিপুঞ্জ ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ এর ইউরোপকেন্দ্রিকতা। এখানে ইউরোপীয়রা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের জন্য সুবিধাজনক নানা শর্ত যুক্ত করে দেয়। আর সেগুলো বিশ্বের অন্যদেশের মনঃপূত না হওয়াতে তারা এর বিরোধিতা করে।

১২. **সাংবিধানিক দুর্বলতা :** ইউরোপের শক্তিশালী দেশ হিসেবে ইংরেজ ও ফরাসিদের নানা স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে সাংবিধানিকভাবে দুর্বল একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় জাতিপুঞ্জ। এ দুর্বলতা এর ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ।

সারাংশ

ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ইংরেজ গোলন্দাজ বেন ক্লাইটিং-এর প্রথম গুলি আর সবশেষে ভার্সাই চুক্তি পর্যন্ত চার বছর ধরে চলে মহাযুদ্ধে। যুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রবাহিনীর ওপর মরণকামড় দিতে জার্মানরা স্প্রিং অফেন্সিভ শুরু করলে তার পাল্টা জবাব আসে হান্ড্রেড ডেজ অফেন্সিভে। জানমালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, নানা আবেগ-উৎকণ্ঠা আর ধ্বংসযজ্ঞ শেষ পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর বিজয় নিয়ে আসে। সবমিলিয়ে বিশ্ব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয় এই বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলোকে। বস্তুত এতবড় সংঘাত ও যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা পায় মানবজাতি।